॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

1742▲

শরণাগতি

शरणागति (बँगला)

GITA PRESS, GORAKHPUR

স্বামী রামসুখদাস

ত্যাগের কথা বলা হয়নি।

চিন্তা করে দেখতে হয় যে এখানে সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কী ? গীতা অনুসারে সম্পূর্ণ ধর্ম বা কর্ম ভগবানে সমর্পণ করাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর দ্বারা সম্পূর্ণ ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করা এবং শুধুমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা—দুটি কথাই সিদ্ধ হয়। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীগণ বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকেন—**'এবং ত্রয়ী ধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)। তাই ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় নিলে তখন আর নিজ ধর্ম নিরূপণের প্রয়োজন থাকে না। পরে অর্জুনের জীবনে এমনই হয়েছে।

কর্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। কর্ণ রথ থেকে নেমে রথের চাকাটি বার করার চেষ্টা করতে করতে অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'আমি যতক্ষণ চাকাটি না বার করতে পারি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর ; কেন-না তুমি রথের ওপরে আছ আর আমি মাটিতে, তাছাড়া আমি অন্য কার্যে ব্যাপৃত আছি। এইসময় কোনো রথীর শরসন্ধান করা উচিত নয়। তুমি সহস্রার্জুনের ন্যায় শস্ত্র ও শাস্ত্রের জ্ঞাতা এবং ধর্মজ্ঞ, তোমার উচিত নয় আমাকে প্রহার করা।' কর্ণের কথায় অর্জুন আর শরসন্ধান করেননি। তখন ভগবান কর্ণকে বললেন যে, 'তোমার মতো আততায়ীকে যে কোনো প্রকারে বধ করাই ধর্ম, পাপ নয়[১] ;

---

[১]আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥
(মনুস্মৃতি ৮।৩৫০-৩৫১)

কেননা আততায়ীর ছটি লক্ষণই তোমার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।[১] আর এখনই তো তোমরা ছয় মহারথীতে মিলিত হয়ে একলা অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে হত্যা করেছ। সুতরাং ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু যে নিজে ধর্মপালন করে না, তার ধর্মের দোহাই দেবার কোনো অধিকার নেই।' একথা বলে ভগবান অর্জুনকে শর-নিক্ষেপের আদেশ দিলেন এবং অর্জুন শরসন্ধান করতে শুরু করলেন।

এইরূপ অর্জুন যদি তাঁর নিজের বুদ্ধিতে ধর্ম নিরূপণ করতেন, তাহলে তিনি ভুল করে ফেলতেন ; তাই তিনি ধর্ম নিরূপণের ভার ভগবানের ওপর দিয়েছিলেন এবং ভগবান ধর্মের নিরূপণ করেও ছিলেন।

অর্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেয়, না না-করাই শ্রেয় (২।৬)। আমরা যদি যুদ্ধ করি, তাহলে আত্মীয়-বধ হবে এবং আত্মীয়-বধ করা অত্যন্ত পাপ। **'স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্যাৎ কুলনাশনম্।'** এর দ্বারা ক্ষতিকারক পরম্পরার সৃষ্টি

'অনিষ্ট করতে আসা আততায়ীকে বিচার না করে হত্যা করা উচিত। আততায়ীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো দোষ হয় না।'

[১]অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহর্তা চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ॥

(বশিষ্ঠস্মৃতি. ৩।১৯)

'অগ্নি সংযোগকারী, বিষ প্রদানকারী, শস্ত্র হাতে নিয়ে মারতে উদ্যত, অর্থের অপহরণকারী, ভূমি ছিনতাইকারী এবং স্ত্রী অপহরণকারী — এই ছয়জনকেই আততায়ী বলা হয়।'

হবে (১।৪০-৪৪)। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় কোনো সাধন নেই। তাই ভগবান বলেছেন যে, কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, ধর্ম কী, অধর্ম কাকে বলে, এসব ঝামেলায় তুমি কেন জড়াচ্ছ ? ধর্ম নিরূপণের ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। '**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য**' কথাটির এই হল তাৎপর্য।

'**মামেকং শরণং ব্রজ**'— '**একম্**' পদটি এখানে '**মাম**'-এর বিশেষণ হতে পারে না। কারণ '**মাম্**' (ভগবান) একই, অনেক নয়। তাই '**একম্**' পদটির অর্থ হিসাবে 'অনন্য' ধরাই উচিত। দ্বিতীয়ত, অর্জুন '**তদেকং বদ নিশ্চিত্য**' (৩।২) এবং '**যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকম্**' (৫।১) পদেও '**একম্**' পদ দ্বারা সাংখ্য এবং কর্মযোগের বিষয়ে এক নিশ্চিত শ্রেয়র সাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই '**একম্**' পদটি দ্বারা ভগবান এখানে জানাচ্ছেন যে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন আছে, সেই সমস্ত সাধন-সমূহের মধ্যে প্রধান সাধন হল এক অনন্য শরণাগতি।

গীতায় অর্জুন তাঁর কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে নানাপ্রকার প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরও দিয়েছিলেন। সেইসব সাধনের মধ্যেও গীতার পূর্বাপর আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত সাধনার সার এবং শিরোমণি হল ভগবানের অনন্যভাবে শরণাগত হওয়া।

ভগবান গীতায় বিভিন্ন স্থানে অনন্য ভক্তির অনেক মহিমা গীত করেছেন। যেমন, দুস্তর মায়া সহজে অতিক্রম করার উপায় একমাত্র অনন্য শরণাগতি[১] (৭।১৪) ; অনন্যচেতা ব্যক্তির কাছে আমি

---

[১]এই শ্লোকে 'এব' পদটি 'অনন্যতা'র বাচক।

সুলভ[১] (৮।১৪) ; অনন্য ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় (৮।২২) ; অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি (৯।২২) ; অনন্য ভক্তির সাহায্যেই ভগবানকে জানা, দেখা ও প্রাপ্ত করা সম্ভব হয় (১১।৫৪) ; অনন্য ভক্তদের আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি (১২।৬-৭) ; অনন্য-ভক্তিই গুণাতীত হওয়ার উপায় (১৪।২৬)। এইভাবে অনন্য ভক্তির মহিমা বলে ভগবান এখানে সম্পূর্ণ গীতার সার বলেছেন—**'মামেকং শরণং ব্রজ'**। অর্থাৎ উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—সবই আমি।

'মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটির তাৎপর্য মন-বুদ্ধির দ্বারা শরণাগতি স্বীকার করা নয়, বরং নিজে (স্বয়ং) ভগবানের শরণাগত হওয়া। কারণ স্বয়ং শরণ গ্রহণ করলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিও স্বয়ং-এর অন্তর্গত এসে যায়, পৃথক থাকে না।

'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'—এখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধের থেকে যে পাপ হওয়ার কথা বলেছিলেন, ভগবান সেই পাপ হতে মুক্তি দেবার প্রলোভন দিয়েছেন। কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অর্জুনের সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে যাবার পর আর কী করে তাঁর পাপ থাকবে[২] এবং তাঁকে প্রলোভন কী করে দেওয়া যাবে অর্থাৎ তাঁকে প্রলোভিত করা সম্ভব নয়। তবে পাপ থেকে মুক্ত করার

---

[১]এই শ্লোকে 'অনন্যচেতাঃ' পদটি অনন্য-আশ্রয়ের বাচক।

[২]সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

প্রলোভন দেওয়া যায় শরণাগত হওয়ার আগে, শরণাগত হওয়ার পরে নয়।

'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব'—কথাটির ভাব হল যে তুমি যখন সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে আমার শরণাগত হয়েছ এবং তারপরেও তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণাদিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি অর্থাৎ সেগুলি শোধরায়নি ; ভগবদ্‌প্রেম, ভগবদ্দর্শন ইত্যাদি হয়নি এবং তোমার নিজের মধ্যে অযোগ্যতা, বলহীনতা, অনধিকারিতা ইত্যাদি ভাব আছে, তাহলেও সেগুলির জন্য তুমি কোনোপ্রকার চিন্তা বা ভয় কোরো না। কারণ তুমি যখন আমার অনন্য শরণাগত হয়েছ, তখন সে সব ন্যূনতা তোমার ন্যূনতা কী করে হল ? সেগুলি শোধরাবার কর্তব্য তোমার কী করে হল ? সে সব ন্যূনতা আমারই ন্যূনতা। এখন সে সব ন্যূনতা দূর করার, শোধরাবার দায়িত্ব হল আমার। তোমার শুধুমাত্র কাজ হল —নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক হয়ে আমার চরণে পড়ে থাকা[১]। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ভয়, চিন্তা, ভ্রম ইত্যাদি দোষ আসে তবে তা শরণাগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে এবং সব দায়িত্বও তোমার উপরে বর্তাবে। শরণাগত হয়ে নিজের ওপর দায়িত্ব রাখা হল শরণাগতিকে কলঙ্কিত করা ।

যেমন, বিভীষণ ভগবান রামের পাদপদ্মে শরণ নেওয়ায় তাঁর সব দোষ ভগবান নিজের দোষ বলে মানতেন। একবার বিভীষণ সমুদ্র পার হন, সেখানে বিপ্রঘোষ গ্রামে তাঁর হাতে এক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের

---

[১]কাহূ কে বল-ভজন কৌ, কাহূ কে আচার।
'ব্যাস' ভরোসে কুঁবরি কে, সোবত পাঁব পসার॥

হত্যাকার্য ঘটে যায়। এতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা সবাই মিলে বিভীষণকে খুব মারধোর করেন, কিন্তু তিনি তাতে মরেননি। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁকে শিকলে বেঁধে মাটির নীচে এক গুহায় আটকে রাখেন। শ্রীরাম বিভীষণের আটক হওয়ার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বিমানে করে বিপ্রঘোষ গ্রামে এলেন এবং বিভীষণের খোঁজ করে তার কাছে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রীরামকে শ্রদ্ধা সহকারে অনেক আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং বললেন, 'হে মহারাজ ! ইনি ব্রহ্মহত্যা করেছেন। আমরা এঁকে খুব মেরেছি, কিন্তু ইনি মরেননি।' ভগবান রাম বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি বিভীষণকে এক কল্প পর্যন্ত আয়ু প্রদান করেছি ও রাজ্য দিয়ে রেখেছি, তাঁকে কী করে মারবেন ? তাছাড়া এঁকে মারার প্রয়োজন কী, ইনি তো আমার ভক্ত। ভক্তের জন্য আমি নিজে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। দাসের অপরাধের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে তার মালিকেরই হয় অর্থাৎ মালিকই তার দণ্ড নেবার অধিকারী। সুতরাং বিভীষণের পরিবর্তে আপনারা আমাকেই দণ্ড প্রদান করুন[১]।' ভগবানের এই প্রকার শরণাগত বাৎসল্যভাব দেখে সব ব্রাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং সকলেই তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য হল এই যে 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার' —এই একাত্মভাবের মতো যোগ্যতা, পাত্র, অধিকারী ইত্যাদি কিছুই

---

[১]বরং মমৈব মরণং মদ্ভক্তো হন্যতে কথম্।
রাজ্যমায়ুর্ময়া দত্তং তথৈব স ভবিষ্যতি॥
ভৃত্যাপরাধে সর্বত্র স্বামিনো দণ্ড ইষ্যতে।
রামবাক্যং দ্বিজাঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াদিদমব্রুবন্॥
(পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড. ১০৪।১৫০-১৫১)

নেই। এটিই হল সকল সাধনার সার। ছোট শিশুও এই একাত্মতার জোরেই মাঝরাতে সমস্ত বাড়িকে সরগরম করে রাখে অর্থাৎ সে যখন রাত্রে কাঁদে তখন সকলে জেগে উঠে তাকে ভোলাতে থাকে। তাই শরণাগত ভক্তের নিজ যোগ্যতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভগবানের সঙ্গে তার একাত্মবোধের প্রতিই দৃষ্টি রাখা উচিত ।

'মা শুচঃ' কথাটির অর্থ হল—

(১) আমার শরণাগত হয়ে তুমি চিন্তা করছ, এটি আমার প্রতি অপরাধ তুল্য, এটি তোমার অহংকার এবং শরণাগতির কলঙ্ক।

আমার শরণাগত হয়েও আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না রাখাই হল আমার প্রতি অপরাধ করা। নিজের দোষ সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রকৃতপক্ষে নিজের বলের অহংকার ; কারণ দোষ দূর করার নিজ সামর্থ্যের আন্দাজ হওয়াতেই ওগুলি মেটানোর চিন্তা হয়ে থাকে। যদি দোষ দূর করার চিন্তা না হয়ে দুঃখ হয় তাহলে দুঃখ হওয়া তত দোষের নয়। যেমন, ছোট শিশুর কাছে কুকুর এলে সে কুকুর দেখে কাঁদে, চিন্তা করে না। তেমনই দোষগুলিকে সহ্য না করা দোষের নয়, বরং দোষ হল চিন্তা করা। চিন্তা করার অর্থ হল যে, তোমার নিজের অন্তরে লুকিয়ে আছে বলের আশ্রয়[১] আর এর কারণ হল তোমার

---

[১]কৌরব সভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছিল, তখন তিনি হাত দিয়ে, দাঁত দিয়ে কাপড় ধরে ভগবানকে ডাকছিলেন। নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে ভগবানকে ডাকতে থাকায়, ভগবান আসতে দেরি করছিলেন। কিন্তু যখন দ্রৌপদী সর্বপ্রকার চেষ্টা ছেড়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভরশীল হলেন, তখন দুঃশাসন বস্ত্র টানতে টানতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন আর বস্ত্রের রাশি জমে উঠল, কিন্তু দ্রৌপদীর কোনো অঙ্গই উন্মোচিত হল না।

অন্তর্নিহিত অহংকার যে তুমি নিজে কিছু করতে পার। আমার ভক্ত হয়েও যদি তুমি চিন্তা কর, তাহলে তোমার চিন্তা দূর হবে কী প্রকারে ? লোকেও তা দেখলে ভাববে যে ভগবানের ভক্ত হয়ে এ চিন্তা করছে ? ভগবান এর চিন্তা দূর করেন না ! তুমি আমাকে বিশ্বাস না করে চিন্তা করলে এটি হবে তোমারই বিশ্বাসের ঘাটতি আর কলঙ্ক হবে আমার, আমার শরণাগতির—তাই এ-চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও।

(২) তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণ শুদ্ধ না হলেও তুমি এর চিন্তা কোরো না, আমি তার চিন্তা করব।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন আর অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে, এই পৃথিবীর ধন-ধান্য সম্বলিত নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করলেও অথবা দেবতাদের ওপর আধিপত্য পেলেও ইন্দ্রিয় শুষ্ককারী আমার এই শোক দূর হবে না। ভগবান যেন বলেছেন, তোমার কথা ঠিকই। কারণ ভৌতিক বিনাশশীল পদার্থের সম্বন্ধ দ্বারা কারও শোক কখনো দূর হয়নি, হতে পারে না এবং তার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু আমার শরণাগত হয়ে যে তুমি শোক করছ, এ অত্যন্ত অন্যায়। আমার শরণ নিয়েও তুমি নিজের ভার নিজেই বহন করছ !

(৪) শরণাগত হয়ে ভক্তের ইহলোক-পরলোক, সদ্‌গতি-দুর্গতি ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করা উচিত নয়। এই নিয়ে এক ভক্ত বলেছেন—

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

'হে নরকাসুর বিনাশকারী প্রভু ! আপনি যদি চান আমাকে স্বর্গে রাখুন বা ভূমণ্ডলে অথবা ইচ্ছা করলে নরকে রাখুন অর্থাৎ আপনি যেখানে রাখতে চান, সেখানেই রাখুন। যা করতে চান, তাই করুন, এই বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই। আমার শুধু একটিই আকাঙ্ক্ষা যে শরৎকালের পদ্মের শোভাকেও তিরস্কৃত করে আপনার অত্যন্ত সুন্দর যে পদযুগল, তা যেন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও আমি চিন্তা করতে পারি। আপনার চরণকে যেন না ভুলে যাই'।

শরণাগতি-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

শরণাগত ভক্ত এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে থাকেন যে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার', একথা স্বীকার করে নেওয়াতে তাঁর ভয়, শোক, চিন্তা, আশঙ্কা ইত্যাদি দোষগুলি দূর হয় অর্থাৎ দোষের আধার নষ্ট হয়। কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে সব দোষই ভগবানে বিমুখ হলেই টিকে থাকে।

ভগবানের শরণাগত হলেও সংসার ও শরীরের আশ্রয়ের সংস্কার থাকে, যা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় হলে দূর হয়[১]। সেগুলি দূর হলে সর্ব দোষ দূর হয়।

সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া কাকে বলে ? ভয়-শোক-চিন্তা-আশঙ্কা, পরীক্ষা ও বিপরীত ভাবনা না হওয়াই হল সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া। এবার

[১]ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় হলে যখন সংসার ও শরীরের কোনোপ্রকার আশ্রয় থাকে না, তখন বাঁচার আশা, মরার ভয়, কাজ করার আকাঙ্ক্ষা ও পাওয়ার লোভ—এই চারটিই থাকে না।

এটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক—

(১) **নিশ্চিন্ত হওয়া**—ভক্ত যখন তার নিজের মেনে নেওয়া জিনিসগুলিসহ নিজেকেও ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন তাঁর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কিঞ্চিৎমাত্রও কোনো চিন্তা হয় না অর্থাৎ কী করে জীবিকা-নির্বাহ হবে ? কোথায় থাকা যাবে ? আমার কী দশা হবে ? কী গতি হবে ? ইত্যাদি চিন্তা একেবারেই থাকে না[১]।

ভগবানের শরণ নিলে শরণাগত ভক্তের মনে এক চিন্তা আসে যে 'যদি আমার জীবন প্রভুর উপযুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ ও সুন্দর না হয় তাহলে আমার জীবনে ভক্তের ন্যায় আচরণ কোথায় ? অর্থাৎ তা নেই। কারণ আমার মনোবৃত্তিগুলি ঠিক নয়।' আসলে 'আমার বৃত্তি' এরূপ মনে করাই দোষণীয়, বৃত্তি তত দোষের নয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলি, শরীর ইত্যাদিতে যে আমার ভাব থাকে—সেটিই ভুল। কারণ যখন আমি ভগবানের শরণাগত হয়েছি আর সবকিছু তাঁকে অর্পণ করেছি, তখন মন-বুদ্ধি ইত্যাদি আর আমার থাকে কী করে ? তাই শরণাগত ভক্তের মন, বুদ্ধি ইত্যাদির অশুদ্ধির চিন্তা কখনো মনে আসতে দিতে নেই অর্থাৎ আমার বৃত্তিগুলি ঠিক নয়—এই ভাব মনে আনতে নেই। কোনো কারণবশত এরূপ চিন্তা এলেও, 'হে ভগবান ! হে আমার প্রভু ! আমাকে রক্ষা করো ! রক্ষা করো !' বলে প্রভুকে ডাকতে হয়, কারণ তিনি আমার স্বামী, আমার সর্বসমর্থ প্রভু,

---

[১]চিন্তা দীনদয়ালকো, মো মন সদা আনন্দ।
জায়ো সো প্রতিপালসী, রামদাস গোবিন্দ॥

সুতরাং আমি কেন চিন্তা করব ? আর ভগবানও বলেছেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না' (**মা শুচঃ**)। অতএব আমি নিশ্চিন্ত—এই বলে মনে মনে ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় এবং নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে বলতে হয় —'হে প্রভু ! আপনিই সর্বসমর্থ, আপনিই জানেন আমার মঙ্গল কিসে হবে।'

সর্বসমর্থ প্রভুর শরণাগতও হবে আবার চিন্তাও করতে থাকবে —এই দুটি অত্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার। কারণ শরণাগত হলে আবার চিন্তা কীসের ? আর চিন্তাই যদি হয় তাহলে শরণাগতি কেমন ? তাই শরণাগত ভক্তের এইরূপ চিন্তা করতে হয় যে ভগবান যখন বলেছেন যে 'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব', তখন আমার এইসব বৃত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে কেন ? 'আমি তো আপনারই। হে ভগবান ! আমি যেন এই বৃত্তিগুলিকে কখনো নিজের বলে মনে না করি। হে প্রভু ! শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এইসব কখনো যেন আমার বলে মনে না হয়। কিন্তু হে ভগবান ! সবকিছু আপনাকে সমর্পণ করার পরেও এই শরীরাদি যদি কখনো কখনো নিজের বলে প্রতীত হয়, তাহলে আমার এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন' — এই বলে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়।

(২) **নির্ভয় হওয়া** — আচরণাদি ঠিক না হলে অন্তরে ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং সাপ, বিছে, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র পশু থেকে বাহ্যিক ভয়ের উৎপত্তি হয়। শরণাগত ভক্তের এই উভয় প্রকারের ভয়-ই দূরীভূত হয়। শুধু তাই নয়, পতঞ্জলি মৃত্যুভয়ের যে পাঁচটি ক্লেশের

কথা বলেছেন[১] এবং যা বড় বড় বিদ্বানেরও হয়ে থাকে[২], সে ভয়ও সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়[৩]।

এবার আমার বৃত্তিগুলিও খারাপ হয়ে যাবে !—সাধকের এইরূপ ভয়পূর্ণ মনোভাবও অন্তর থেকে দূর করতে হয়। কারণ 'আমার উপর অশেষ ভগবদ্‌কৃপা রয়েছে, এখন আমার আর কোনো কিছুতে ভয় নেই। এই বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে করেছিলাম বলেই আমি এগুলিকে শুদ্ধ করতে পারিনি। কারণ এগুলিকে নিজের মনে করাই মলিনতা—**'মমতা মল জরি জাই'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক)। তাই এবার থেকে আমি কখনো এগুলিকে নিজের মনে করব না। বৃত্তিগুলিই যখন আমার নয় তখন আমার ভয় কীসের ? এখন তো শুধু ভগবানের কৃপা ! তাঁর কৃপাই সর্বত্র পরিপূর্ণ ! এটি অতিশয় আনন্দের ও প্রসন্নতার কথা !'

কেউ কেউ আশঙ্কা করেন যে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর ভজনা করলে তো দ্বৈতভাব হয় অর্থাৎ ভগবান ও ভক্ত—এই দুই ভাব

---

[১]অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। (যোগদর্শন ২।৩)

[২]স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। (যোগদর্শন ২।৯)

[৩]তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩৩)

'হে ঠাকুর ! যাঁরা আপনার ভক্ত, যাঁরা আপনার পাদপদ্মে তাঁদের সত্যকার প্রীতি উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁরা কখনো জ্ঞানাভিমানীদের মতো নিজেদের সাধনা থেকে চ্যুত হন না ।' প্রভু ! এঁরা মহাবিঘ্ন প্রদানকারী সৈনিকদের মাথার ওপর পা রেখে নির্ভয়ে বিচরণ করে থাকেন, কোনো বিঘ্নই তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

হয় এবং দ্বিতীয়ের থেকে ভয় হয় —**'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি'** (বৃহদারণ্যক ১।৪।২)। কিন্তু এই শঙ্কা অমূলক। ভয় দ্বিতীয়ের থেকে হলেও আত্মীয়ের থেকে হয় না অর্থাৎ ভয় অপরের থেকে হয়, নিজের থেকে নয়। প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর-সংসার দ্বিতীয় অর্থাৎ পর, তাই সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই ভয় হয়। কারণ এগুলির সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক থাকতেই পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ; যেমন, একটি জড়, অপরটি চেতন, একটি বিকারশীল, অন্যটি নির্বিকার, একটি পরিবর্তনশীল আর অপরটি অপরিবর্তনশীল, একটি প্রকাশ্য অন্যটি প্রকাশক ইত্যাদি।

ভগবান দ্বিতীয় অর্থাৎ পর নন। তিনি পরম আত্মীয়। কারণ জীব তাঁর সনাতন অংশ, স্বরূপ। সুতরাং ভগবানের শরণাগত হলে তাঁর থেকে ভয় কী করে হবে ? বরং তাঁর শরণ নিলে মানুষ চিরকালের মতো অভয় হয়ে যায়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে শিশু মায়ের থেকে দূরে থাকলে ভয় পায়, কিন্তু মায়ের কোলে গেলে তার ভয় দূর হয়, কারণ মা তার নিজের। ভগবানের ভক্ত তার থেকেও বিশিষ্ট, কারণ শিশু ও মায়ের মধ্যে ভেদ দেখা যায়, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানে ভেদ থাকা সম্ভবই নয়।

(৩) **শোকহীন হওয়া**— যে ঘটনা ঘটে গেছে, তার জন্য শোক হয়। ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য শোক করা অত্যন্ত ভুল ; কারণ যা হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল আর যা না হওয়ার, তা কখনো হতে পারে না এবং এখন যা হচ্ছে তা বাস্তবিক হবার বলেই হচ্ছে, তাই

তাতে শোক করার কোনো কারণ নেই[১]। প্রভুর এই মঙ্গলময় বিধান জেনে শরণাগত ভক্ত সর্বদা শোকহীন থাকে ; শোক তার কাছে কখনো আসতেই পারে না।

(৪) **নিঃশঙ্ক হওয়া**—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কে কখনো এমন সন্দেহ যেন না আসে যে আমি ভগবানের কি না ? ভগবান আমাকে স্বীকার করেছেন কি না ? বরং এই ব্যাপারটি দেখতে হয় যে 'আমি অনাদিকাল থেকে ভগবানেরই ছিলাম, আছি এবং চিরকালই থাকব। আমি মূর্খতাবশত ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক মেনে নিয়েছিলাম, বিমুখ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে যতই ভগবানের থেকে পৃথক বলে মনে করি, তবুও তাঁর থেকে পৃথক হতে পারি না আর থাকা সম্ভবও নয়। যদি আমি পৃথক হতে চাইও, তবুও তা সম্ভব হবে কী করে ? কেন-না ভগবান বলেছেন যে জীব আমারই অংশ —**'মম এব অংশঃ'** (গীতা ১৫।৭)। এইরূপ 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার'—এই প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করলেই সমস্ত আশঙ্কা সন্দেহ দূর হয়ে যায়, সে সবের কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

(৫) **পরীক্ষা না করা**—ভগবানের শরণাগত হয়ে এমন পরীক্ষা করতে নেই যে 'আমি যখন ভগবানের শরণাগত হয়েছি তখন আমার মধ্যে এই-এই লক্ষণ হওয়া উচিত। যদি এইসব লক্ষণ দেখা

---

[১]রাম কীন্‌হ চাহহিঁ সোই হোঈ। করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।১২৮।১)

হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।৫২।৪)

না যায়, তাহলে আর ভগবানের শরণাগত কী করে হলাম ?' বরং **'অদ্বেষ্টা'** ইত্যাদি (গীতা ১২।১৩-১৯) গুণগুলির নিজের মধ্যে অভাব দেখলে আশ্চর্য হওয়া উচিত যে আমার মধ্যে এই ঘাটতি কী করে এল ![1] যদি এরূপ ভাব জাগে তাহলে গুণগুলির ঘাটতি দূর

---

[1]এই বিষয়ে এক গ্রাম্য কাহিনী আছে। এক মহিলার তিন পুত্র, বড় দুজন কাজ করে, ছোটটি সহজ সরল। মায়ের মৃত্যু হলে, বড় দুই ছেলে ছোট ভাইকে বলল গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিতে, সে বলল্পঠিক আছে। গঙ্গা বাড়ি থেকে ৩০০ মাইল দূরে, ছোট ভাই রওনা হল। পথে ক্লান্ত হয়ে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল —'ভাই ! গঙ্গা কত দূরে ?' সে বলল, 'তুমি ১৫০ মাইল এসেছো আরও ১৫০ মাইল বাকি।' ছেলেটি ভাবল কখনই বা গঙ্গায় যাব আর কখনই বা ফিরব ! তাই দুঃখিত মনে সে অস্থি জঙ্গলে ছুঁড়ে দিয়ে গ্রাম থেকে বর্ষার জল কলসীতে ভরে নিল। কারণ গঙ্গা থেকে সে গঙ্গাজল নিয়ে আসত। সে গ্রামে ফিরে এল। বড় ভাই ভাবল যে, ভাই গঙ্গায় গেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরত না, ও গঙ্গায় যায়নি। বড় ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল্প'তুই গঙ্গায় গিয়েছিলি তো ?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ডে অস্থি বিসর্জন দিয়ে, গঙ্গাজল নিয়ে এসেছি।' এইভাবে সে মিথ্যা কথা বলল। ভাই বুঝল যে সে মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু সে চুপ করে থাকল। দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে উঠে অন্য বড় ভাই বলল—'ভাই! ঠিক করে বল, তুমি গঙ্গায় ঠিকমতো অস্থি বিসর্জন দিয়েছ তো ?' সে বলল, 'হ্যাঁ গঙ্গাতেই গিয়েছিলাম।' বড় ভাই বলল—'দেখ, আমি রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখেছি, মা বলেছেন যে তুমি অস্থি গঙ্গাতে না দিয়ে মাঝপথে ফেলে এসেছো। তুমিই বল মায়ের কথা সত্য, না তোমার কথা সত্য ?' ছোটো ভাই বলল—'মা ওদিকে না গিয়ে এদিকে এলেন কেন ? অর্থাৎ আমি তো ১৫০ মাইল পৌঁছে গিয়েছিলাম, ওদিকে গেলে তো গঙ্গাতেই পৌঁছে যেতেন।'

এই কাহিনীটির অর্থ এই যে ভগবানের শরণাগত হওয়ার পর নিজেকে এভাবে পরীক্ষা করা যে—'কই ! আমার মধ্যে তো ভক্ত বা সাধু-সন্তের লক্ষণ ঘটছে না, অতএব আমি ভগবানের শরণাগত নই।' এরূপ ধারণা করাই হল উল্টো ধারণা পোষণ করা অর্থাৎ মা উল্টোদিকে কেন এলেন ? এতে কাজ হয়

হয়। কারণ সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে থাকে যে 'অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি গুণ আগে যত কম ছিল, এখন আর তত কম নেই। শরণাগত হলে ভক্তের যতপ্রকার লক্ষণ আছে, তা বিনা প্রযত্নেই প্রকাশিত হতে থাকে।

(৬) **বিপরীত ধারণা না করা**—ভগবানের শরণাগত ভক্তের মনে এরূপ বিপরীত ধারণা কী করে আসে যে 'আমি ভগবানের নই'। কারণ এটি আমার মানা বা না-মানার ওপর নির্ভর নয়। ভগবানের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তা অটুট, অখণ্ড এবং নিত্য। আমি এটির দিকে খেয়াল না করে ভুল করেছি। এখন সেই ভুল দূর হয়েছে। বিপরীত ধারণা আর কী করে হবে ?

যে ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করে নেয়, তার মধ্যে ভয়, শোক, চিন্তা ইত্যাদি দোষ থাকে না। তার শরণাগত-ভাবটি স্বতই দৃঢ় হতে থাকে ; যেমন—বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আর পতিগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বতঃই দৃঢ় হতে থাকে। এ-সম্বন্ধ এতদূর পর্যন্ত দৃঢ় হয় যে যখন সেই কন্যা ঠাকুমা হয়, তখন তার আর স্বপ্নেও এই ভাব আসে না, যে আমি এখানকার নই। তার মনে দৃঢ় ভাব থাকে যে, আমি এখানকারই

না। বরং এরূপ দৃঢ় ধারণা রাখতে হয় যে 'যখন আমি ভগবানের শরণাগত হয়েছি তাহলে ভক্তের যে সকল গুণ, আমার মধ্যে তার ঘাটতি কী করে হল ? আমার মধ্যে এই সব লক্ষণ কেন আসেনি ?' এরূপ দৃঢ় ধারণা রাখলে সাধক প্রকৃত শরণাগত হবেন এবং পূর্ণতা লাভ করবেন। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে, যেহেতু আমার মধ্যে ভক্তের লক্ষণ ঘটছে না, অতএব আমি শরণাগত নই, তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা হবে।

আর এই সবই আমার। যখন তার পৌত্রবধূ আসে এবং ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকে তখন সে (ঠাকুমা) বলতে থাকে, দেখ এই অন্য ঘরের মেয়ে এসে আমার ঘর বরবাদ করে দিল। তখন সেই বৃদ্ধার (ঠাকুমার) মনে থাকে না যে, সেও তো অপর ঘরের (অন্য পরিবারের) মেয়ে। তাৎপর্য হল এই যে, বানানো সম্পর্কেও যখন এত দৃঢ়তা হতে পারে, তখন ভগবানেরই অংশ এই প্রাণীর ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য-সম্পর্ক আছে, তা যে দৃঢ় হবে—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ! আসলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয় সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করলেই।

সত্যিকার হৃদয় দিয়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হয়ে সেই ভক্তের যদি কোনো ভাব, আচরণ ইত্যাদির কোনো ন্যূনতা থাকে, কখনো বিপরীত ধারণা উৎপন্ন হয় অথবা কোনো পরিস্থিতিতে পড়ে পরবশ হয়ে কখনো কোনো দুষ্কর্ম ঘটে যায়, তাহলে তার হৃদয়ে জ্বালার সৃষ্টি হবে। তাই তার আর অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। ভগবান কৃপা করে তাকে সেই পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন[১]।

ভগবান কেবল ভক্তের একাত্মবোধই দেখেন, গুণ বা

---

[১]স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪২)

‘যে প্রেমিক ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণ অনন্যভাবে ভজনা করে থাকেন, তাঁর দ্বারা অকস্মাৎ যদি কোনো পাপ-কর্ম ঘটে যায় তাহলে তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরি সেই পাপ সর্বতোভাবে নাশ করে থাকেন।’

দোষগুলিকে নয়[১]। অর্থাৎ ভগবান ভক্তের দোষ লক্ষ্যই করেন না, ভক্তের সঙ্গে তাঁর যে একাত্মবোধ তিনি শুধু তাই দেখেন। কারণ স্বরূপত ভক্ত সর্বদাই ভগবানের। দোষ আগন্তুক, তা আসে ও যায় ; কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিত্য একইভাবে বিরাজিত। তাই ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই এই বাস্তবিকতার দিকে থাকে। যেমন, ধুলো-বালি মাখা অবস্থায় শিশু তার মায়ের কাছে এলে, মার লক্ষ্য শিশুর দিকেই যায়, ময়লার দিকে নয়। শিশুও ময়লার দিকে নজর করে না। মা পরিষ্কার করুন বা না করুন, শিশুর কাছে ময়লা নেই-ই, তার চোখে কেবল মা-ই থাকে। দ্রৌপদীর মনে কত দ্বেষ ও ক্রোধ জমা হয়েছিল – দুঃশাসনের রক্তে চুল ধোব, তবেই চুল বাঁধব ! কিন্তু দ্রৌপদী যখনই ভগবানকে ডাকতেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ আসতেন। কারণ তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর গভীর একাত্মবোধ ছিল।

ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ হলে দুটি ভাব হয়—(১) ভগবান আমার ও (২) আমি ভগবানের। দুটিতেই ভগবানের সম্বন্ধ সমানভাবে থাকলেও 'ভগবান আমার'—এই ভাবে ভগবানের থেকে নিজের আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হতে পারে যে, 'ভগবান আমার হলে আমার ইচ্ছা কেন পূরণ করেন না ?' কিন্তু 'আমি ভগবানের' এই ভাবে ভগবানের থেকে নিজ আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হয় না। কারণ 'আমি ভগবানের হলে ভগবান আমার জন্য যা উচিত মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে তাই করেন।' তাই সাধকের উচিত তিনি যেন ভগবানের

---

[১]রহতি ন প্রভু চিত চূক কিয়ে কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।৩)

ইচ্ছাতেই নিজ ইচ্ছা মিলিয়ে দেন এবং ভগবানের ওপর কোনো আধিপত্য না করেন, অর্থাৎ ভগবানের আধিপত্য যেন সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন। কখনো ভগবান আমাদের ইচ্ছা পূরণ করলে, তাতে সঙ্কোচ বোধ করা উচিত যে আমার জন্য ভগবানের এই কাজ করতে হল ! যদি মনস্কামনা পূর্ণ হলে সঙ্কোচ না এসে সন্তুষ্টি আসে তাহলে সেটি শরণাগতি নয়। শরণাগত ভক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভগবানের ইচ্ছা মনে করে প্রসন্ন থাকেন।

শরণাগত ভক্তের কখনো নিজের জন্য কিছুই করার বাকি থাকে না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত মমতাসম্পন্ন বস্তু-সমেত নিজেকেও ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তখন করা বা করানোর সকল কাজই ভগবানের হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তাঁর ওপর প্রভুর অপার কৃপা অনুভব করে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, মত্ত হয়ে থাকেন। যেমন—গরুড়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে কাকভূশুণ্ডি তাঁকে তাঁর পূর্বের ব্রাহ্মণ জন্মের কথা শোনালেন, যাতে লোমশ ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে পক্ষিকুলের নীচ চণ্ডাল পক্ষি কাকরূপে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কাকভূশুণ্ডির মনে তার জন্য কোনো ভয় বা দীনতা আসেনি। তিনি তাতে ভগবানের শুদ্ধ বিধানই অনুভব করেছিলেন। শুধু বোঝেনইনি, মনে মনে বলে উঠেছিলেন যে **'উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৩।১)। এরূপ ভীষণ শাপগ্রস্ত হয়েও যখন কাকভূশুণ্ডির প্রসন্নভাব একটুও বিচলিত হল না, তখন লোমশ ঋষি তাঁকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত মনে করে নিজের কাছে

ডেকে বালক রামের ধ্যানমন্ত্র জানালেন। তারপর ভগবানের কথা শুনিয়ে, প্রসন্ন হয়ে কাকভূশুণ্ডির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন যে—'আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে অবাধ, অখণ্ড রামভক্তি থাকবে। তুমি শ্রীরামের প্রিয় হবে এবং সমস্ত গুণের আকর হবে। যে রূপ চাইবে, তাই ধারণ করবে, যেস্থানে থাকবে তার এক যোজন পর্যন্ত কোনো মায়াকণ্টক থাকবে না' ইত্যাদি। এইভাবে অনেক আশীর্বাদ দিতেই আকাশবাণী হল যে, 'হে ঋষি! তুমি যা সব বলেছ, তা সত্য হবে, এ কায়মনোবাক্যে আমারই ভক্ত।' এ কথায় ভগবানের বিধানে সদা প্রসন্ন কাকভূশুণ্ডি বলে উঠলেন—

ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজন প্রতাপ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৪ খ)

এখানে **'ভজন-প্রতাপ'** শব্দটির অর্থ হল—ভগবানের বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা। অত্যন্ত বিপরীত অবস্থাতেও প্রেমিক ভক্তের প্রসন্নতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রেমের স্বরূপই হল প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাওয়া।

মানুষের যেটি নিজস্ব সেটি তার প্রিয় হয়ে থাকে, এই হল স্বাভাবিক নিয়ম। সমস্ত জীবকে ভগবান তাঁর প্রিয় বলে মনে করেন—**'সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৮৬।২) আর এই জীবেরও প্রভুকে স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় বলে মনে হয়। তবে একথা আলাদা যে এই জীব পরিবর্তনশীল জগৎ ও শরীরকে ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে নিজ প্রিয় প্রভু থেকে বিমুখ

হয়ে পড়ে। সে বিমুখ হলেও ভগবান নিজে কখনো কাউকে ত্যাগ করেননি এবং ত্যাগ করতে পারেনও না। কারণ জীব সর্বদাই সাক্ষাৎ ভগবানেরই অংশ। তাই সমস্ত জীবের সঙ্গে ভগবানের আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ, অখণ্ডিতরূপে স্বাভাবিকভাবেই বজায় থাকে। তিনি জীবের ওপর কৃপা পরবশ হয়ে ভক্তদের রক্ষা এবং দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন—এই তিনটি কাজের জন্য সময় সময়ে অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন[১] (গীতা ৪।৮)। এই তিন ব্যাপারেই ভগবানের আত্মীয়তাই দেখা যায়, নচেৎ ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনাতে ভগবানের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। এই তিনটি কাজই ভগবান কেবল প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণের জন্য করে থাকেন। এর দ্বারা ভগবানের প্রাণীদের সঙ্গে স্বাভাবিক আত্মীয়তা, কৃপালুতা, প্রিয়তা, হিতৈষিতা, সহৃদয়তা এবং নিরপেক্ষ উদারতা প্রমাণিত হয় এবং এখানেও সেদিকে লক্ষ্য করেই অর্জুনকে তিনি বলেছেন— **'মদ্ভক্তো ভব, মন্মনা ভব, মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু'**। এই চারটি কথায় ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে তাঁর অভিমুখী করা, যাতে সমস্ত জীব অসৎ পদার্থ থেকে বিমুখ হয়। কারণ দুঃখ, শোক, বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করা, বিপত্তি ঘটা ইত্যাদির প্রধান কারণই হল ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়া।

---

[১]পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(গীতা ৪।৮)

ভগবান যা কিছু বিধান করেন, তা সংসার-মাত্রেরই সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন—ভগবানের এই কৃপার দিকে যদি প্রাণীরা দৃষ্টি দেয় তাহলে আর তাদের কিছু করার বাকি থাকে না। সমস্ত জীবের হিতের জন্য ভগবানের হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা থাকে, তাই তিনি **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'**-এর মতো অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলে দিয়েছেন। কারণ ভগবান জীবমাত্রকেই নিজের বলে মনে করেন— **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (৫।২৯) এবং তাদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে তারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা আছে, তার মধ্যে কোনো একটি সাধনার সাহায্যে সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় এবং দুঃখ-শোক ইত্যাদি চিরকালের মতো সমূলে দূর করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্কৃপাতেই জীবের উদ্ধার হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা আছে, সেগুলি সবই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবদ্তত্ত্ব জানা মহাপুরুষগণের দ্বারাই প্রকটিত হয়েছে[১]। সুতরাং এইসব সাধনায় ভগবদ্কৃপাই ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। সাধনা করায় সাধক তো নিমিত্তমাত্র হয়, কিন্তু সাধনার সিদ্ধিতে ভগবদ্কৃপাই প্রধান।

শরণাগত ভক্তের এমন চিন্তাও কখনো করতে নেই যে এখনও ভগবদ্দর্শন হল না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হয়নি, বৃত্তিসকল

---

[১]হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

শুদ্ধ হয়নি ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তা করাই যেন বাঁদরের বাচ্চার মতো হওয়া। বাঁদর-বাচ্চা নিজেই মাকে আঁকড়ে থাকে। বাঁদরী লাফায়-ঝাঁপায় এদিক-ওদিক যায় আর বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

ভক্তের সমস্ত চিন্তাই ভগবানে অর্পণ করতে হয় অর্থাৎ তিনি দর্শন দেবেন কি দেবেন না, প্রেম করবেন কি করবেন না, বৃত্তিগুলি ঠিক করবেন কি করবেন না, আমাকে পরিশুদ্ধ করবেন কি করবেন না — এ সবই ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। ভক্তকে বিড়ালের বাচ্চার মতো হতে হয়। বিড়াল-বাচ্চা তার মায়ের ওপর নির্ভর করে। বিড়ালী তাকে যেমন খুশি রাখে, যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়। বিড়ালী যখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, বাচ্চা পা গুটিয়ে চুপ করে থাকে। তেমনই শরণাগত ভক্ত জগতের থেকে তাঁর হাত-পা গুটিয়ে[১] শুধু ভগবদ্-চিন্তা, নাম-জপ ইত্যাদি করতে করতে ভগবানের দিকেই চেয়ে থাকেন। তিনি ভগবানের সকল বিধানেই পরম প্রসন্ন থাকেন, কোনো কিছুতেই নিজের মনের আগ্রহ রাখেন না।

যেমন, কুমোর প্রথমে মাটিকে মাথায় করে নিয়ে আসে, সেটি তারই ইচ্ছামতো, পরে সেই মাটিকে ভিজিয়ে দলন করে, সেটিও তার ইচ্ছামতো, তারপরে চাকে তুলে ঘোরায়, তাও তারই (কুমোরেরই) ইচ্ছামতো। মাটি কখনো বলে না যে তুমি কলসী তৈরি

---

[১]ভক্ত যা কিছু করেন, সেগুলি ভগবানেরই মনে করে, ভগবানেরই শক্তি মেনে নিয়ে, ভগবানেরই জন্য করে থাকেন, নিজের জন্য কিছুই করেন না—এই হল তাঁর হাত-পা গুটিয়ে রাখা।

কর, হাঁড়ি তৈরি বা ভাঁড় তৈরি কর। কুমোর তার ইচ্ছামতো যা খুশি তৈরি করে। শরণাগত ভক্তও তেমনই নিজের মনে কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। তিনি যত বেশি নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হন, ততই ভগবদ্‌কৃপা তাঁকে আরও অধিকভাবে কৃপার অনুকূল করে তোলে আর যত তিনি চিন্তা করেন, নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেন, ততই ভগবদ্‌কৃপা আসার পথে বাধার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শরণাগত হলে ভগবানের যে বিশেষ, অলৌকিক, অখণ্ড কৃপা বর্ষিত হয়, নিজে চিন্তা করলে সেই কৃপাতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়।

যেমন, ধীবর মাছ ধরার জন্য জাল ফেললে, সব মাছই জালের ভেতরে ধরা পড়ে, শুধু যেগুলি ধীবরের পায়ের কাছে থাকে—তারা ধরা পড়ে না। তেমনই ভগবানের মায়াতে (সংসারে) মমত্ববোধ করে জীব আবদ্ধ হয় আর জন্ম ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। কিন্তু যে জীব মায়াধীশ ভগবানের চরণের শরণ নেয়, সে মায়া অতিক্রম করে—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (গীতা ৭।১৪)। এই দৃষ্টান্তের একটি অংশই গ্রহণযোগ্য। কারণ ধীবরের তো মাছ ধরার ভাব থাকে ; কিন্তু ভগবানের জীবগণকে মায়াতে আবদ্ধ করার কোনো ভাব বা ইচ্ছা থাকে না। বরং তাঁর ভাব হল জীবদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে তাঁর শরণাগত করে নেওয়া, তাইতো তিনি বলেন—**'মামেকং শরণং ব্রজ'**। জীব সংযোগজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষায় নিজেই মায়াতে আবদ্ধ হয়।

ঘুরন্ত যাঁতার মধ্যে যেমন সমস্ত বীজই চূর্ণ হয়ে যায়[১] ; কিন্তু যে

---

[১]চলতী চক্কী দেখকর দিয়া কবীরা রোয়।
দো পাটনমে আয়কে সাবুত বচা ন কোয়॥

আধারটির ওপর যাঁতাটি ঘোরে, সেই দণ্ডের আশপাশের দানাগুলি চূর্ণ হয় না, তেমনই জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতের ঘুরন্ত যাঁতায় পড়ে সকল জীবই নিস্পেষিত হয় অর্থাৎ দুঃখ পেতে থাকে ; কিন্তু যে আধারের ওপর সংসার-চক্র চলতে থাকে, সেই ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণকারী জীব সেই নিস্পেষণ থেকে রক্ষা পায়— **'কৌঙ্গ হরিজন উবরে, কীল মাকড়ী পাস'**। কিন্তু এই উদাহরণ সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ বীজ তো স্বাভাবিকভাবেই দণ্ডের কাছে থেকে যায়, সেগুলি রক্ষা পাবার কোনো চেষ্টা করে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপর্য এই যে যারা ভগবানের অংশ হয়েও জগৎ-সংসারকে আপন বলে মনে করে অথবা সংসারের থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখভোগ করতে থাকে।

সংসার ও ভগবান—এই দুইয়ের সম্পর্ক দুপ্রকারের। সংসারের সঙ্গে শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তবিক। সাংসারিক সম্পর্ক মানুষকে পরাধীন করে, গোলাম বানায়, কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক মানুষকে স্বাধীন করে, চিন্ময় করে এবং ভগবানেরও মালিক বানিয়ে তোলে।

কোনো বিষয়ে নিজের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা হল প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতা। মানুষ যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়ে নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা ওই বিদ্যা ইত্যাদিরই পরাধীনতা, দাসত্ব হয়ে থাকে। যেমন, কেউ যদি অর্থের জন্য নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে

করে, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য বাস্তবে অর্থেরই হল, মানুষটির নয়। সে নিজেকে অর্থের মালিক বলে মনে করলেও, আসলে সে অর্থের গোলাম।

সংসারের নিয়ম হল যে সাংসারিক কোনো বস্তু নিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে বিশেষ কিছু বলে মনে করে, সেই বস্তুটিই তাকে তুচ্ছ করে দেয়, পদদলিত করে রাখে। কিন্তু যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়ে সর্বদা তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকেন, তিনি নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেন না, বরং ভগবানেরই অলৌকিকত্ব, বিশেষত্ব ও বিচিত্র-ভাব প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান তাকে তাঁর মাথার মণি করে রাখুন, বা নিজের প্রভু করে নিন, তাহলেও সে নিজের মধ্যে কোনোরকম বৈশিষ্ট্য দেখে না এবং তার কোনো বিষয়ে অহংভাব আসে না। এরূপ ভক্তের মধ্যে ভগবানের বিশেষ ভাব আবির্ভূত হয়। কারও কারও মধ্যে এই বিশেষ ভাব এত বেশি দেখা যায় যে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুগুলিও চিন্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যে জড়ত্বের একান্তই অভাব হয়ে যায়। এরূপ ভগবানের কত প্রেমিক ভক্ত ভগবানে মিশে গেছেন, শেষকালে তাঁদের দেহও পাওয়া যায়নি। যেমন, ভক্তিমতি মীরা সশরীরে ভগবানের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল চিহ্নরূপে তাঁর শাড়ির একটি ছোট টুকরো বিগ্রহের মুখে আটকে ছিল, আর কিছুই ছিল না। এইভাবে সন্ত তুকারামও সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন।

জ্ঞানমার্গে শরীর চিন্ময়ত্ব লাভ করে না। কারণ জ্ঞানী অসৎ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে, অসৎ-এর থেকে পৃথক হয়ে স্বয়ং চিন্ময়-

তত্ত্বে স্থিত হন। কিন্তু ভক্ত যখন ভগবানের সম্মুখীন হন, তখন তাঁর দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সবই ভগবানের সম্মুখীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে যাঁর দৃষ্টি কেবল চিন্ময় তত্ত্বের প্রতি, অর্থাৎ যাঁর দৃষ্টিতে চিন্ময়-তত্ত্ব ছাড়া জড়ত্বের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সেই চিন্ময়তা তাঁর শরীর ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত হয় এবং শরীরাদি চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সাধারণ লোকে তাঁর শরীরে জড়ত্ব দেখলেও, বাস্তবে তাঁর শরীর চিন্ময় হয়ে যায়।

সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবানের কৃপা শরণাগতের জন্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, কিন্তু জগৎকে স্নেহপূর্বক পালনকারিণী এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন বাৎসল্যময়ী মাতা লক্ষ্মীদেবীর প্রভুর শরণাগতদের প্রতি কত স্নেহ, কত ভালোবাসা, তার বর্ণনা কেউ করতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে পতিব্রতা স্ত্রী পিতৃভক্ত পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়ত, প্রেমভাবপূর্ণ প্রভু যখন তাঁর ভক্তদের দেখার জন্য গরুড় বাহনে করে আসেন, তখন মাতা লক্ষ্মীদেবীও তাঁর সঙ্গে গরুড়ে করে আসেন, যে গরুড়ের পাখায় সামবেদের মন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়। কিন্তু কেউ কেউ ভগবানকে চায় না, চায় শুধু মাতা লক্ষ্মীদেবীকেই। ভক্তদের ভালোবাসায় মা আসেন, কিন্তু তাঁর বাহন হল দিবান্ধ পেঁচা। এরূপ বাহনবিশিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করে মানুষ মদান্ধ হয়ে যায়। মাকে যদি কেউ ভোগ্যা বলে মনে করে তাহলে তার নিশ্চিত ভারী পতন হয় ; কেন-না সে তো তার মাকেই কু-দৃষ্টিতে দেখেছে, তাই সে মহা অধম ব্যক্তি।

তৃতীয়ত, যেখানে শুধু ভগবানকে ভালোবাসা হয়, সেখানে তো ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মাতা লক্ষ্মীদেবীও আসেন, কিন্তু যেখানে শুধু লক্ষ্মীদেবীকেই কামনা করা হয়, সেখানে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে যে ভগবানও আসবেন—এমন কোনো নিয়ম নেই।

শরণাগতির বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সীতা, রাম এবং হনুমান জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন। সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ওপর একটি লতা বেড়ে উঠেছিল। সেই লতার নরম তন্তু ছেয়ে গিয়েছিল। সেই তন্তুতে কোথাও কচি-কচি মুকুল বেরিয়েছে, কোথাও তাম্রবর্ণ পাতা বেরিয়েছে, ফুল আর পাতায় লতাটি ছেয়ে রয়েছে, তাতে সেই বৃক্ষটির সুন্দর শোভা হয়েছে, দেখতে অতি চমৎকার লাগছে। সেই বৃক্ষশোভা দেখে রাম হনুমানকে বললেন, 'হনুমান, দেখো এই লতাটি কী সুন্দর ! গাছটির চারিদিকে ছেয়ে আছে ! এই লতাটি তার সুন্দর সুন্দর ফল, সুগন্ধিত ফুল আর সবুজ পাতায় এই বৃক্ষের শোভা কেমন বাড়িয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের অন্য সব বৃক্ষের চেয়ে এই বৃক্ষটিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে ! শুধু তাই নয়, এই বৃক্ষটির জন্যই সমস্ত জঙ্গলটিই শোভাময় হয়ে আছে। এই লতাটির জন্যই বনের পশু-পক্ষী এই বৃক্ষটিকেই আশ্রয় করছে। ধন্য এই লতা !'

ভগবান রামের মুখে লতার প্রশংসা শুনে সীতা হনুমানকে বললেন, 'দেখো বাবা হনুমান ! তুমি কি খেয়াল করেছ যে এই লতাটির ওপরে ওঠা, ফুল-পাতায় পল্লবিত হওয়া, তন্তুগুলির বিস্তার লাভ করা—এসবই বৃক্ষের আশ্রয়ে হয়েছে, বৃক্ষের জন্যই হয়েছে।

বৃক্ষই এই লতাটির শোভার কারণ। তাই এর মূল মহিমা হল বৃক্ষই। আধার তো বৃক্ষই। বৃক্ষটির আশ্রয় ছাড়া লতাটি নিজে কি কিছু করতে পারত ? কেমন করে বিস্তার লাভ করত ? এখন বলো হনুমান, মহিমা বৃক্ষটিরই কি না ?'

রাম বললেন—'কি হনুমান ! এই মহিমা লতারই তো ?'

হনুমান বললেন—'আমি অন্য কথা চিন্তা করছি।'

সীতা জিজ্ঞাসা করলেন—'সেটি কী বাবা ?'

হনুমান বললেন—'মা ! বৃক্ষ ও লতার ছায়া খুবই সুন্দর। তাই আমার এই দুটির ছায়াতে থাকতেই ভালো লাগছে অর্থাৎ আমার আপনাদের দুজনের ছায়াতে (শ্রীচরণের আশ্রয়ে) থাকাই ভালো লাগে।'

সেবক সুত পতি মাতু ভরোসেঁ। রহই অসোচ বনই প্রভু পোসেঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৪।৩।২)

এমনিতে ভগবান আর তাঁর দিব্য হ্লাদিনী শক্তি—একে অপরের শোভা বর্ধন করে। কিন্তু কেউ কেউ তো ওই দুজনকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন, আবার কেউ কেবল ভগবানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন ; আবার কেউ শুধু তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। শরণাগত ভক্তের পক্ষে প্রভু এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি—উভয়ের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ।

একবার এক প্রজ্ঞাচক্ষু (নেত্রহীন) সাধু লাঠি হাতে যমুনার ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। নদীতে বন্যা এসেছিল। তাতে একস্থানে যমুনার পাড় ভেঙ্গে গেল এবং সাধুও সেখানে জলে পড়ে গেলেন আর লাঠি হস্তচ্যুত হল। তিনি দেখতেও পান না, কী করে সাঁতার দেবেন ?

ভগবানের শরণাগতির কথা স্মরণে আসায় তিনি সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করে শরীর ভাসিয়ে দিলেন, তখন তাঁর মনে হল কে যেন তাঁর হাত ধরে পাড়ে উঠিয়ে দিল। সেখানে অন্য একটি লাঠি হস্তগত হওয়ায় তিনি তার সাহায্যে চলতে শুরু করলেন। তাৎপর্য হল যে যাঁরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে ভগবানের ওপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁদের নিজেদের জন্য কিছু করতে হয় না। ভগবানের বিধানে যা কিছু হয়, তাতেই তাঁরা প্রসন্ন থাকেন।

অনেকগুলি ভেড়া-ছাগল জঙ্গলে চরতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি ছাগল চরতে চরতে লতায় আটকে গিয়েছিল। সেই লতাটি ছাড়িয়ে মুক্ত হতে তার অনেক সময় লাগল। ততক্ষণে অন্য ছাগল-ভেড়াগুলি নিজেদের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্ধকারও হয়ে আসছিল। সেই ছাগলটি ঘুরতে ঘুরতে এক সরোবরের কাছে পৌঁছাল। সেখানে ভেজা মাটিতে সিংহের পায়ের ছাপ পড়েছিল, ছাগলটি সেই পায়ের ছাপের শরণাগত হয়ে তার কাছে বসল। রাত্রে শিয়াল, ভাল্লুক, বাঘ ইত্যাদি প্রাণী ছাগলটিকে খাবার জন্য এল, তখন ছাগলটি বলল যে, 'আগে দেখ আমি কার শরণ নিয়েছি, তারপরে আমাকে খেও!' তারা সেই চিহ্ন দেখে বলাবলি করতে লাগল ; 'আরে ! এতো সিংহের শরণ নিয়েছে, শীগ্‌গির পালাও এখান থেকে ! সিংহ এসে পড়লে আর রক্ষা নেই।' এইভাবে সকল প্রাণী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। শেষকালে সেই সিংহ এল এবং ছাগলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই জঙ্গলে একলা কী করে আছ?' ছাগল বলল, 'আগে এই পায়ের ছাপ দেখ,

তারপরে কথা বল। এখানে এটি যার পায়ের ছাপ, আমি তারই শরণাগত।' সিংহ দেখল, 'আরে এতো আমারই পদচিহ্ন, এতো আমার শরণই নিয়েছে।' তখন সে ছাগলকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পেও না, এখানে নির্ভয়ে থাক।'

রাত্রে যখন হাতি জল খেতে এল তখন সিংহ হাতিকে বলল, 'তুমি এই ছাগলকে নিজের পিঠে করে জঙ্গলে চরিয়ে আন, সবসময় একে তোমার পিঠেই রাখবে, নাহলে তুমি তো জান আমি কে ? তোমাকে মেরে ফেলব !' সিংহের কথায় হাতি কাঁপতে লাগল এবং শুঁড়ে করে ছাগলকে পিঠে তুলে নিল। ছাগল তখন নির্ভয়ে হাতির পিঠের ওপরে বসে গাছের উঁচু ডাল থেকে কচি মুকুল ও পল্লব খেতে থাকল আর বেশ মজায় থেকে গেল।

খোজ পকড় সৈঁঠে রহো, ধনী মিলেঙ্গে আয়।
অজয়া গজ মস্তক চঢ়ে নির্ভয় কোঁপল খায়।।

এমনভাবে মানুষ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সকল প্রাণী থেকে, বাধা-বিঘ্ন থেকে, নির্ভয় হয়ে যায়। তাকে কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে না, তার কোনো কিছু কেউ নষ্ট করতে পারে না।

জো জাকো শরণো গহৈ, বাকহঁ তাকী লাজ।
উলটে জল মছলী চলে, বহ্যো জাত গজরাজ।।

ভগবানের সঙ্গে কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ইত্যাদির দ্বারা যে কোনো সম্পর্ক পাতানো হোক না কেন, সবই জীবের মঙ্গলকারী

হয়ে থাকে[১]। তাৎপর্য হল এই যে, এসবের সাহায্যে যাঁরা

---

[১]কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯-৩০)

'একজন নয়, অনেক ব্যক্তিই কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ দ্বারা মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করে এবং নিজের সকল পাপ মুছে সেইভাবেই ভগবানকে লাভ করে, যেমন, ভক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করে। যেমন, গোপীরা কাম দ্বারা, কংস ভয়ের দ্বারা, শিশুপাল-দন্তবক্ত্র প্রমুখ রাজারা দ্বেষের দ্বারা, যদু বংশীয়রা পারিবারিক সম্পর্কের দ্বারা, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি স্নেহ দ্বারা এবং নারদাদি ভক্তি দ্বারা নিজ মন ভগবানে নিবিষ্ট করেছেন।'

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৩-৭)

ভগবান বলেছেন—হে নিষ্পাপ উদ্ধব ! এ একযুগের কথা নয়, সমস্ত যুগেরই এক রকম কথা। সৎসঙ্গ অর্থাৎ আমার সম্বন্ধের প্রভাবেই দৈত্য-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্যক এবং বিদ্যাধরগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং অন্ত্যজাদি রজোগুণী-তমোগুণী প্রকৃতির বহু জীবই আমার পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি,

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাঁরাই উদ্ধার লাভ করেছেন, কিন্তু যাঁরা কোনোভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেননি, ভগবানের থেকে দূরে রয়েছেন, তাঁরা ভগবদ্‌প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। ভগবানের অনন্যভক্তদের সম্পর্কে নারদ বলেছেন—

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

(নারদভক্তিসূত্র ৭২)

'সেই ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়াদির ভেদ থাকে না।'

তাৎপর্য হল এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর নিয়ে সাংসারিক যত প্রকার জাতি, বিদ্যার পার্থক্য হওয়া সম্ভব, তার কোনোটিই তাঁদের ওপর প্রযোজ্য হয় না, যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন[১]। কারণ তাঁরা অচ্যুত ভগবানেরই লোক

বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপিগণ, যজ্ঞপত্নী ও অন্যান্যেরাও সৎসঙ্গের প্রভাবেই আমাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ওইসব ব্যক্তি বেদের স্বাধায়ও করেননি এবং বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেননি। তেমনই তাঁরা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা কোনো তপস্যা করেননি। শুধুমাত্র সৎসঙ্গ—আমার সম্বন্ধের প্রভাবেই এঁরা আমাকে প্রাপ্তি লাভ করেছেন।

[১]পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ. অরণ্যকাণ্ড ১০।২০)

'আমার ভজনা করায় পুরুষ-নারীর পার্থক্য অথবা জাতি, নাম বা আশ্রম কোনো কারণ নয়, বরং আমার ভক্তিই একমাত্র কারণ।'

—'যতস্তদীয়াঃ' (নারদভক্তিসূত্র ৭৩), সংসারের নয়। অচ্যুত ভগবানের হওয়ায় এঁদের 'অচ্যুত-গোত্র' বলা হয়[১]।

শরণাগতির রহস্য

শরণাগতির কী রহস্য—তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবুও আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা বলার চেষ্টা করছি ; কেন-না প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা বলে থাকেন, তাতে তাঁদের বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এখানে বলা কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করেন। কারণ প্রায়শ লোকে তাত্ত্বিক রহস্যপূর্ণ

কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্যা।
যস্যাস্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোঽন্যস্ততস্ত্রিভুবনে পুরুষোঽস্তি ধন্যঃ॥
(ব্র. স. ভ ১৭)

'সকলের বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণে (ব্রাহ্মণকুলে) জন্ম হলে কী হয় ? সমস্ত শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কী হয় ? অর্থাৎ কিছুই হয় না। যার হৃদয়ে ভগবানে ভক্তি বিরাজ করে, ত্রিভুবনে তার মত ধন্য আর কে হতে পারে ?'

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

'ব্যাধের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ আচরণ ছিল ? ধ্রুবের কত বয়স হয়েছিল ? গজেন্দ্রের কী বিদ্যা ছিল ? বিদুর কোন্ উচ্চ জাতির ছিলেন ? যদুপতি উগ্রসেনের কী পরাক্রম ছিল ? কুব্জা কী সুন্দরী ছিলেন ? সুদামার কাছে কী ধন ছিল ? তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্‌প্রাপ্তি করেছিলেন। কারণ ভগবানের কেবল ভক্তিই প্রিয়, তিনি কেবল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন, আচরণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে নয়।'

[১]পিতৃগোত্রী যথা কন্যা স্বামীগোত্রেণ গোত্রিকা।
শ্রীরামভক্তিমাত্রেণাচ্যুতগোত্রেণ গোত্রকঃ॥ (নারদপাঞ্চরাত্র)

বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন না করে অতি শীঘ্র তার বিপরীত অর্থ করে নেয়। তাই এরূপ বিষয় বলার ও শোনার ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়।

ভগবান গীতায় শরণাগতির বিষয়ে দুটি কথা বলেছেন—

(১) **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) 'অনন্যভাবে কেবল আমার শরণাগত হও।'

(২) **'স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** (১৫।১৯) 'সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বভাবে আমার ভজনা করেন', **'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'** (১৮।৬২), 'তুমি সর্বভাবে সেই পরমাত্মার শরণাগত হও।'

আমরা কীভাবে ভগবানের শরণাগত হব ? কেবলমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল ভগবানের গুণ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ নিজের জন্য কোনো সাংসারিক কামনা না রাখা।

কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার রহস্য হল এই যে ভগবানের অনন্ত গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য, মহিমা, লীলা, নাম-ধাম আছে, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য আছে, কিন্তু শরণাগত ভক্ত এই বিভূতিগুলি দেখেন না। তাঁর শুধু একটি ভাবই থাকে যে 'আমি শুধু ভগবানের এবং কেবলমাত্র ভগবানই আমার'। যদি তিনি গুণ, প্রভাব ইত্যাদি দেখে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তাহলে সেটি আসলে গুণ ও প্রভাবাদিরই শরণ নেওয়া হয়, ভগবানের শরণ নয়। কিন্তু এই কথাগুলির বিপরীত অর্থ যেন ধরা না হয়।

বিপরীত অর্থ কী ? ভগবানের গুণ, প্রভাব, নাম, ধাম, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে না মানা এবং সেগুলিকে গ্রাহ্য না করা।

কিছুই না করা, ভজন না করা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলাকথা না শোনা, ভগবদ্ধাম না মানা—এ সবই বিপরীত অর্থ করা। এরূপ অর্থ মনে করলে খুবই ভুল করা হয়।

কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার অর্থ হল—শুধু ভগবান আমার। তিনি যদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন হন তো ভালো, আর কোনো ঐশ্বর্য যদি না থাকে তাহলেও ভালো। তিনি যদি অত্যন্ত দয়ালু হন, তাহলে অত্যন্ত ভালো কথা আর তা না হয়ে যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর হন অর্থাৎ তাঁর মতো নিষ্ঠুর, কঠোর যদি জগতে আর কেউ না থাকে, তাহলেও খুব ভালো। তিনি যদি প্রভাবশালী হন, তাহলে খুবই ভালো আর তাঁর যদি কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলেও খুব ভালো। শরণাগতের এইসব বিষয়ে কোনোই চিন্তা থাকে না। তাঁর একটিই ভাব থাকে যে ভগবান যেমনই হোন, তিনি আমার[১]। শরণাগত ভক্ত যদি এ সবের প্রতি গুরুত্ব না দেয়, তাহলে ভগবানের ঐশ্বর্য,

---

[১]অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা।
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা শ্যামঃ স এবাদ্য গতির্মমায়ম্॥

'আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অসুন্দর হোন বা সুন্দর-শিরোমণি হোন, গুণহীন হোন অথবা গুণীশ্রেষ্ঠ হোন, আমার প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন হোন অথবা কৃপাসিন্ধুরূপে কৃপা করতে থাকুন, তিনি যেমনই হোন না কেন, তিনিই আমার একমাত্র গতি।'

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (শিক্ষাষ্টক ৮)

'তিনি আমাকে হৃদয়ে যুক্ত করে আনন্দিত করুন অথবা শ্রীচরণে ফেলে দলিত করুন বা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন ! সেই পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইচ্ছা তেমন করুন, আমার তিনিই একমাত্র প্রাণনাথ, আর কেউই নয়।'

মাধুর্য, সৌন্দর্য, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি যে চলে যাবে, তা নয়। কিন্তু আমরা যদি সে সবের গুরুত্ব না দিই, তবেই আমাদের প্রকৃত শরণাগতি হবে।

যেখানে গুণ, প্রভাব ইত্যাদির জন্য ভগবানের শরণাগতি নেওয়া হয়, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া হয় না, বরং গুণ, প্রভাব ইত্যাদির শরণই নেওয়া হয় ; যেমন—কোনো ধনী ব্যক্তির সম্মান করা হলে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান করা হয় তার টাকার, সেই ব্যক্তির নয়। কোনো মন্ত্রীকে যে সম্মান করা হয় তা আসলে তাঁর নয়, সেগুলি তাঁর (মন্ত্রী) পদের সম্মান। কোনো বলবান ব্যক্তিকে যে সম্মান করা হয়, সেটি তাঁর বলবত্তার সম্মান, মানুষটির নয়। কিন্তু যদি কেউ শুধু ব্যক্তিটিকেই (ধনী বা মন্ত্রী ইত্যাদির) সম্মান করে তাহলে এর দ্বারা তাঁর যে ধন বা মন্ত্রীত্ব চলে যাবে—তা তো নয়, সেগুলো থাকবেই। তেমনই কেবল ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানের গুণ, প্রভাব যে চলে যাবে—তা নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি তো কেবল ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, তাঁর গুণ ইত্যাদির দিকে নয়।

সপ্তর্ষিগণ যখন পার্বতীর সম্মুখে শিবের নানা দোষ ও বিষ্ণুর বিবিধ গুণের বর্ণনা করে তাঁকে শিবের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বললেন তখন পার্বতী তাঁদের বলেছিলেন—

মহাদেব অবগুন ভবন, বিষ্ণু সকল গুন ধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম।।

(শ্রীরামচরিতমানস ১।৮০)

এরূপ কথা গোপিনীরাও উদ্ধবকে বলেছিলেন—

উধো ! মন মানে কী বাত।
দাখ ছোহারা ছাড়ি অমৃতফল, বিষকীরা বিষ খাত॥
জো চকোর কো দৈ কপূর কোউ, তজি অঙ্গার অঘাত।
মধুপ করত ঘর কোরে কাঠমে, বঁধত কমলকে পাত॥
জ্যো পতঙ্গ হিত জান আপনো, দীপক সোঁ লপটাত।
'সুরদাস' জাকো মন জাঁসো, তাকো সোই সুহাত॥

যাঁরা ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি দেখেন, তাকে ভালোবাসেন —তাঁরা মুক্তি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভ করলেও ভগবানকে লাভ করেন না। যাঁরা ভগবানের প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করেন না, সেই ভগবদ্‌প্রেমী ভক্তই ভগবানকে লাভ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রেমিক ভক্ত তাঁকে বাঁধতেও পারেন, তাঁকে বিক্রিও করে দিতে পারেন। ভগবান দেখেন যে এ শুধু আমাকেই ভালবাসে, আমার প্রভাবের দিকে তাকিয়েও দেখে না, তাই তাঁর মনে এরূপ ভক্তের অত্যন্ত আদর হয়ে থাকে।

প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মধ্যে কিছু পাওয়ার কামনা আছে। আমাদের মনে ওইসব কামনার বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা আছে। যতক্ষণ আমাদের মনে কামনা থাকে, ততক্ষণ আমরা তাঁর প্রভাব দেখে থাকি। আমাদের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে তাহলে ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে আমাদের লক্ষ্য যাবে না। শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকলে তবেই আমরা তাঁর শরণাগত হয়ে যাব এবং ভগবানের আপনজন হয়ে যাব।

পুতনা রাক্ষসী তার স্তনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে খাওয়ানোর জন্য ভগবান তাকে মাতৃগতি দেন[১], **'জসুমতি কী গতি পাঈ'** অর্থাৎ মাতা যশোদার যে মুক্তি প্রাপ্য, পুতনা রাক্ষসীও তাই লাভ করে। যে মুখে বিষ তুলে দেয়, তাকে ভগবান মুক্তি প্রদান করেন। আর তাহলে যিনি প্রত্যহ দুধপান করান, সেই মাতাকে ভগবান কী দেবেন ? অনন্ত জীবের মুক্তি প্রদানকারী ভগবান সেই মায়েরই অধীন হয়ে যান ; তিনি তাঁকে নিজেকেই প্রদান করেন। মায়ের এত বশীভূত হন যে, মা লাঠি দেখালে তিনি ভয়ে কাঁদতে থাকেন ! কারণ মায়ের তো ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে কোনো লক্ষ্যই থাকে না। এইভাবে যাঁরা ভগবানের কাছে মুক্তি চান, ভগবান তাঁদের মুক্তি প্রদান করেন, আর যাঁরা কিছুই চান না, ভগবান তাঁদের নিজেকেই প্রদান করেন।

সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার রহস্য হল যে, আমার শরীর ভালো, ইন্দ্রিয় বশে আছে, মন-শুদ্ধ নির্মল, বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করে, আমি লেখাপড়া জানি, যশস্বী, সংসারে আমার সম্মান আছে—এইভাবে 'আমিও কেউ একজন' এরূপ ভেবে ভগবানের শরণ নেওয়াকে শরণাগতি বলে না। ভগবানের শরণ নিয়ে

---

[১]অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২৩)

'অহো ! পাপিনী পুতনা যাঁকে মারার জন্য স্তনে কালকূট-বিষ লাগিয়েছিলেন, সেই পুতনার যদি এই গতি লাভ হয়, যা ধাত্রীর পাওয়া উচিত, তবে তিনি ছাড়া এমন কোন্ দয়ালু আছেন যাঁর শরণ নেওয়া যাবে ?'

শরণাগতের এমন চিন্তাও করা উচিত নয় যে, আমার শরীর এমন হওয়া চাই ; আমার বুদ্ধি এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মন এরূপ হওয়া উচিত ; আমার ধ্যান এরূপ হওয়া উচিত ; আমার ভাবনা এরূপ হওয়া উচিত ; আমার জীবনে এরূপ লক্ষণ আসা উচিত ; আমার আচরণ এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মধ্যে এমন প্রেম হওয়া উচিত যাতে কথা-কীর্তন শুনলে চোখে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় ; কিন্তু আমার জীবনে তো সেরকম হয়নি, তাহলে আমি কী করে ভগবানের শরণাগত হলাম ? ইত্যাদি । এইগুলি অনন্য শরণাগতির কষ্টিপাথর নয়। যিনি অনন্যভাবে শরণ নিয়েছেন, তিনি দেখেনই না তাঁর শরীর সুস্থ না অসুস্থ, মন চঞ্চল না স্থির, বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন না অজ্ঞান, তিনি মূর্খ না বিদ্বান, তাঁর যোগ্যতা আছে, না তিনি অযোগ্য ? তিনি স্বপ্নেও এসবের দিকে তাকিয়ে দেখেন না। কারণ তাঁর কাছে এ সবই বর্জনীয় জঞ্জাল, যেগুলি সঙ্গে নেবার নয়। এসবের দিকে দৃষ্টি দিলে অহংবোধই বাড়ে যে 'আমি ভগবানের শরণাগত ভক্ত' অথবা নিরাশ হতে হয় যে 'আমি ভগবানের শরণ নিলেও ভক্তের গুণাবলী **'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥'** ইত্যাদি (গীতা ১২।১৩-১৯) তো আমাতে বর্তায়নি।' তাৎপর্য হল এই যে যদি তাঁর মধ্যে ভক্তের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অহং-অভিমান হবে আর দেখা না গেলে নিরাশা আসবে। তাই সব থেকে ভালো এই যে ভগবানের শরণাগত হওয়ার পর এইসব গুণের দিকে ভুলেও নজর না দেওয়া। কিন্তু এর এই রকম বিপরীত অর্থ করা উচিত নয় যে,

আমি চাইলে হিংসা-বিরোধ করি, চাইলে দ্বেষ করি, চাইলে মমতা করি—চাইলে যা খুশি করি না কেন, কিছু এসে যাবে না। তাৎপর্য হল যে গুণগুলির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা উচিত নয়। ভগবানের শরণাগত হওয়া ভক্তের মধ্যে এইসব গুণ স্বতই এসে যাবে। কিন্তু এগুলি আসা অথবা না আসায় তাঁর কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। নিজেকে কোনো মানদণ্ড দিয়ে কখনও পরীক্ষা না করা উচিত যে, এইসব গুণ অথবা লক্ষণ আমার মধ্যে আছে কি না ?

সত্যিকারের শরণাগত ভক্ত তো ভগবানের গুণের দিকে নজর দেন না এবং নিজের গুণের দিকেও তাকান না। তিনি ভগবানের উচ্চ প্রেমিকদের দিকেও দেখেন না যে উচ্চ প্রেমিকগণ এইরূপ হন ; তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষ এইরূপ হয়ে থাকেন প্রভৃতি !

সাধারণত লোকে এই রকম প্রশ্ন করে থাকে যে ওই ব্যক্তি তো ভগবানের ভজনা করে, তাহলে অসুখ হল কেন ? ভগবানের ভক্তের জ্বর হল কেন ? ও এত দুঃখ পেল কেন ? ওর সন্তান কেন মারা গেল ? ওর কেন অর্থের অভাব হল ? ওর কেন অপযশ হল ? ওর কেন অসম্মান হল ? ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন অত্যন্ত হীন, নিম্নশ্রেণীর প্রসঙ্গ। এসব লোকেদের কী করে বোঝানো যাবে ! তারা সৎসঙ্গের ধারে কাছেও আসেনি, তাই এরা জানেও না ভক্তি কী, শরণাগতি কাকে বলে ? এরা এসব বুঝতেই পারে না। তার মানে এই নয় যে ভগবদ্‌ভক্ত গরীবই হবে, জগতে তার অপমানই হবে, নিন্দাই হবে। শরণাগত ভক্তের তো নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-অসুখ ইত্যাদি কোনো কিছুতে কোনোই উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি সেদিকে খেয়ালই করেন না। তিনি শুধু এটাই দেখেন যে ভগবান আছেন আর আমি আছি, ব্যাস। এবার জগতে কী আছে, কী নেই, ত্রিলোকে কী আছে, কী নেই, প্রভু এই প্রকার, তিনি উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারী—এইসব

বিষয়ের দিকে তাঁর দৃষ্টিই যায় না।

কোনো এক ব্যক্তি একজন সন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কোন্ ভগবানের ভক্ত ? যিনি উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় করে থাকেন, তাঁর ভক্ত কি ?' সন্ত উত্তর দিলেন — 'আমার ভগবানের তো উৎপত্তি-স্থিতি বা প্রলয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এটা তো আমার প্রভুর একটি ঐশ্বর্য। এ কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়।' শরণাগত ভক্তের এইরূপই হওয়া উচিত। ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে তাঁর দৃষ্টি দেওয়াই উচিত নয়।

ঋষিকেশে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যাবেলায় সৎসঙ্গ হচ্ছিল। গরম কাল। হঠাৎ গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলে এক ভদ্রলোক বললেন —'কী সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।' পাশের এক ভদ্রলোক তাঁকে বললেন—'হাওয়ার দিকে দেখার আপনি সময় পেলেন কী করে ? ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, না গরম হাওয়া বইছে—সেদিকে আপনার লক্ষ্য গেল কী করে ?' ভগবদ্ভজনায় ব্যাপৃত হয়ে, হাওয়া ঠাণ্ডা হল না গরম, সুখ এল না দুঃখ—সেদিকে যতক্ষণ খেয়াল থাকবে, ততক্ষণ ভগবানের দিকে কী করে খেয়াল থাকবে ? এই ব্যাপারে আমি একটি কাহিনী শুনেছি, যদিও সেটি নিম্ন শ্রেণীর কিন্তু তার সারমর্ম অত্যন্ত উত্তম।

এক কুলটা নারী ছিল। কোনো এক ব্যক্তি তাকে ইশারা করল যে এইসময় তুমি অমুক স্থানে আসবে। তাই সে সেইসময় তার প্রেমিকের কাছে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটি মসজিদ ছিল, তার দেওয়ালগুলি ছোট ছোট। সেই দেওয়ালের কাছেই মসজিদের মৌলবী নত হয়ে নামাজ পড়ছিলেন। সেই কুলটা নারী না জেনে তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। মৌলবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন যে, আরে এ কেমন মহিলা ! আমার ওপর জুতোশুদ্ধ পা রেখে আমাকে অশুদ্ধ

করে গেল ! তিনি সেখানেই বসে নারীটির ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই কুলটা নারী যখন ফিরে এল, মৌলবী তখন তাকে ধমক দিলেন, 'কেমন বেয়াক্কেলে মানুষ তুমি ! আমি বসে নামাজ পড়ছিলাম আর তুমি আমার ওপর পা রেখে চলে গেলে !' তখন সেই নারী বলল—

ম্যায় নর-রাচী না লখী, তুম কস লখ্যো সুজান।
পঢ়ি কুরান বৌরা ভয়া, রাচ্যো নহিঁ রহমান॥

অর্থাৎ একটি পুরুষের ধ্যানে মগ্ন থাকায় আমি বুঝতে পারিনি যে সামনে দেওয়াল না মানুষ, কিন্তু আপনি তো ভগবানের ধ্যান করছিলেন, তাহলে আপনি কী করে আমাকে চিনতে পারলেন যে আমিই সেই ? যদি আপনি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, তাহলে কী আমাকে চিনতে পারতেন ? কে এল, কে গেল, মানুষ না পশু-পক্ষী, কী ছিল, কী ছিল না, কে ওপরে এল, কে নীচে গেল, কে পা রাখল—এ সবে আপনার কী করে খেয়াল হল ? অর্থাৎ একমাত্র ভগবানকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে মন যায় কী করে ? অন্য বিষয় জানা সম্ভব হয় কী প্রকারে ? যতক্ষণ অন্য বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়, ততক্ষণ তাঁর শরণাগতি হয় কেমন করে ?

বালক বয়সে কৌরব-পাণ্ডব অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন। শিক্ষাশেষে তাঁরা তৈরি হয়ে উঠলেন। তখন তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হল। একটি গাছের ওপর একটি নকল পাখি বসানো হল এবং সবাইকে বলা হল যে ওই পাখির কণ্ঠ বিদ্ধ করে দেখাও। এক এক করে সকলে আসতে লাগল। গুরু দ্রোণ প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'বল, তুমি ওখানে কী দেখছ ?' কেউ বলল 'আমি গাছ দেখতে পাচ্ছি,' কেউ বলল, 'আমি গাছের কচি শাখা দেখতে পাচ্ছি,' কেউ বলল, 'আমি পাখি দেখতে পাচ্ছি', 'ঠোঁটও দেখতে পাচ্ছি', 'পাখাও দেখতে

পাচ্ছি।' যারা একথা বলল, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। যখন অর্জুনের পালা এল, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল 'অর্জুন, তুমি কী দেখছ ?' অর্জুন বললেন, 'আমি শুধু কণ্ঠই দেখতে পাচ্ছি, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' তখন অর্জুনকে তীর চালাতে বলা হল। অর্জুন তীর দিয়ে পাখির কণ্ঠভেদ করলেন। কারণ তাঁর দৃষ্টি ঠিক লক্ষ্যের ওপরই ছিল। যদি পাখি, বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি দেখতেন, তাহলে লক্ষ্য কী করে ভেদ করতেন ? এখন তো দৃষ্টি ছড়ানো আছে, লক্ষ্য হলে তখন সেটিই দেখবে, যাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। লক্ষ্য ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাবে না। এইরূপ যতক্ষণ মানুষের লক্ষ্য এক হয়নি, ততক্ষণ সে অনন্য কী করে হবে ? অব্যভিচারী 'অনন্যযোগ' হওয়া উচিত — '**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী**' (গীতা ১৩।১০)। 'অন্যযোগ' হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, অহম্ ইত্যাদির সাহায্য না থাকা উচিত। সেখানে কেবল একমাত্র ভগবানই 'অনন্যযোগ' হওয়া উচিত।

গোস্বামী তুলসীদাস মহারাজকে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আপনি যে রামলালাকে ভক্তি করেন, তিনি দ্বাদশ কলার অবতার, আর সুরদাস যে কৃষ্ণের ভক্তি করেন, তিনি ষোড়শ কলার অবতার।' একথা শুনেই গোস্বামী মহারাজ তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন—'আহা, আপনি কী কৃপা করলেন ! আমি তো রামকে দশরথের বালক পুত্র ভেবে তাঁকে ভক্তি করতাম। এখন বুঝলাম তিনি দ্বাদশ কলার অবতার ! ইনি এত বড় ? আপনি আজ নতুন কথা শুনিয়ে আমার অনেক উপকার করলেন।' এখন শ্রীকৃষ্ণ যে ষোড়শ কলার অবতার, সে কথা তিনি শুনতেই পাননি, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না।

ভগবানের প্রতি ভক্তদের পৃথক পৃথক ভাব হয়ে থাকে। কেউ

বলেন দশরথের ক্রোড়ে ক্রীড়ারত যে রামলালা, তিনিই আমার ইষ্ট —**'ইষ্টদেব মম বালক রামা'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৭৫।৩) ; রাজাধিরাজ রামচন্দ্র নয়, শিশু রামলালা। কোনো ভক্ত বলেন, আমার ইষ্ট নাড়ুগোপাল, নন্দের দুলাল। এই ভক্তরা তাঁদের রামলালাকে, নন্দলালাকে সাধুদের দিয়ে আশীর্বাদ দেওয়ান, তো ভগবানের তা অত্যন্ত প্রিয় লাগে। তাৎপর্য হল এই যে ভক্তদের দৃষ্টি ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকেই যায় না।

যা ব্রজরজ কী পরস সে, মুকতি মিলত হ্যায় চার।
বা রজকো নিত গোপিকা, ডারত ডগর বুহার॥

অঙ্গনের যে ধুলোয় কানাই খেলা করেন, সেই ধুলো যিনি গ্রহণ করেন, তিনি চার প্রকারের মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মাতা যশোদা সেই ধুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। মায়ের কাছে তো সেগুলি ধুলো-ময়লা। এখন মুক্তি কার চাই ? মায়ের দৃষ্টি তো শুধু কানাইয়েরই দিকে। কানাইয়ের ঐশ্বর্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই আর যোগ্যতার দিকেও না।

সাধু মহাপুরুষগণ বলেছেন যে যদি ভগবানকে পেতে চাও, তবে সঙ্গে যেন কোনো সঙ্গী বা বস্তু না থাকে অর্থাৎ সঙ্গী ও বস্তু ছাড়াই তাঁকে লাভ কর। সঙ্গী আর সাহায্য যখন তোমার সঙ্গে রয়েছে, তখন আর তুমি ভগবানকে পাবে কী করে ? তাছাড়া মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ ইত্যাদি বস্তু সঙ্গে থাকলে, সেগুলির জন্য ব্যবধান থাকবেই। ব্যবধান থাকলে মিলন হয় না। সেখানে বস্ত্রের জন্যও ব্যবধান হয়, বস্ত্রই শুধু নয়, মাঝখানে ফুলের মালা থাকলে, তার জন্যও ব্যবধান হয়। তাই সঙ্গে কোনো সঙ্গী বা জিনিসপত্র যেন না থাকে ; তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে মিলন হবে, তা অত্যন্ত বিশিষ্ট ও দিব্যমিলন হবে।

এক মহাত্মার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করা একজন ব্রজবাসী গোয়ালার দেখা হয়েছিল। সে ভগবদ্ভক্ত ছিল। মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন —'তুমি কী কর ?' সে উত্তর দিল — 'আমি তো আমার লালা কানাইয়ের কাজ করি।' মহাত্মা বললেন—'আমি ভগবানের অনন্য ভক্ত, তুমি কী ?' সে বলল—'আমি ফনন্য ভক্ত ।' মহাত্মা জিজ্ঞাসা করলেন—'ফনন্য ভক্ত আবার কী ?' তখন সেও জিজ্ঞাসা করল— 'অনন্য ভক্ত কী ?' মহাত্মা বললেন—'অনন্য ভক্ত তাঁকেই বলে, যিনি সূর্য, শক্তি, গণেশ, ব্রহ্মা ইত্যাদি কাউকেই না মেনে শুধু কানাইকেই মানেন।' তখন গোয়ালা বলল— 'বাবাজী, আমি তো এইসব লোকের নামও জানি না যে এঁরা সব কে ? আমার তো এঁদের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, তাহলে আমি ফনন্য ভক্ত হলাম কি না ?' এইরূপ ব্রহ্ম কী ? আত্মা কাকে বলে ? সগুণ ও নির্গুণ কী ? সাকার ও নিরাকার কেমন হয় ?—এইসব বিষয়ের প্রতি শরণাগত ভক্তের দৃষ্টি থাকাই উচিত নয়।

ব্রজের একটি কাহিনি। এক সাধু কূয়ার কাছে বসে কারও সঙ্গে ব্রহ্ম আছে, পরমাত্মা আছে, জীবাত্মা আছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেখানে এক গোপী জল নিতে এল। সে কান পেতে শুনল বাবাজী কী নিয়ে আলোচনা করছেন। সে অন্য গোপীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আরে সখি ! এই ব্রহ্ম কী ?' সে বলল, 'আমাদের লালারই কোনো প্রতিবেশী, আত্মীয়-কুটুম্ব হবে ! আমরা তো সখী জানি না ! এরা তার কথাতেই ব্যস্ত। তাই সব জানে। আমাদের তো একমাত্র নন্দলালাই আছে। কোনো কাজ থাকলে নন্দবাবাকে বলে দেব, গিরিরাজকে বলে দেব যে, মহারাজ ! আপনি কৃপা করুন। কানাই অত্যন্ত সহজ সরল, ও কী বা বুঝবে আর কী করবে ? কানাইয়ের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে ? আরে সখি ! এই

কানাই তো আমাদের, আর কী চাই ? আমরাও একলা, কানাইও একলা। আমাদেরও কিছু নেই, তারও কিছু নেই, একদম দিগম্বর,–
'নগন মূরতি বাল-গোপালকী, কতরনী বরণী জগ-জালকী।'
এইরূপ কানাইয়ের কাছে কী পাওয়া যাবে ?

যশোদা মাতা বলরামকে বলছেন—'দেখ ! এই কানাই অত্যন্ত সহজ-সরল, তুমি এর খেয়াল রেখো, যেন জঙ্গলে হারিয়ে না যায়।' দাদা বলরাম বলছেন—'মা ! এই কানাই অত্যন্ত চঞ্চল। আমার সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে কোনো সাপের বাসা দেখলেই তার মধ্যে হাত দিয়ে দেয়, যদি ওকে কোনো সাপ কামড়ে দেয় ?' মা বলেন—'বাবা ! এখনও ও ছোট, অবোধ বালক, তুমি বড়, তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।' তাই বড় ভাই এবং সব গোপবালক কানাইয়ের দিকে নজর রাখতেন। গোপবালকদের এবং যশোদা মাতাকে যদি কেউ বলে যে কানাই সমস্ত জগতের পালন করেন, তাহলে তারা বলবে যে তোমাদের তেমন ভগবান থাকতে পারেন যিনি সমস্ত জগতের পালন করেন। আমাদের তা নয়। আমাদের এই ছোট্ট কানাই কী করে জগৎ পালন করবে ?

একজন বাবাজী গোপীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন যে 'কৃষ্ণ কত ঐশ্বর্যশালী, তাঁর কত মাধুর্য, তাঁর ঐশ্বর্যের খনি আছে, ইত্যাদি।' তখন গোপীরা বললেন—'মহারাজ ! সেই খনির চাবি আমাদের কাছে আছে। কানাইয়ের কী আছে ? তার কাছে কিছুই নেই। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কোথা থেকে দেবে ?' সুতরাং কারো যদি কিছু চাইতে হয় তাহলে সে যেন কানাইয়ের কাছে না যায়। যার কখনো কোনো কিছুরই দরকার নেই, সে-ই যেন কানাইয়ের কাছে যায়, তার শরণাগত হয়। কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে অর্থাৎ

বিপদ, মৃত্যু ইত্যাদিতেও 'আমাকে একটু সাহায্য করো, রক্ষা করো' এরূপ ভাব যেন না হয় !

ভগবান শ্রীরামকে বাল্মীকি বলেছেন—

জাহি ন চাহিয় কবহুঁ কছু তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৩১)

কিছু না চাওয়ার ভাব হলে ভগবান স্বাভাবিকই প্রিয় হন, মধুর লাগেন—'**তুম্হ সন সহজ সনেহু।**' যার মধ্যে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, সেই ভগবানের নিজস্ব ঘর—'**সো রাউর নিজ গেহু।**' যদি আকাঙ্ক্ষাও থাকে আর ভগবানকেও সঙ্গে রাখে তবে সে ভগবানের নিজস্ব ঘর নয়। ভগবানের সঙ্গে যেন 'সহজ' ভালোবাসা হয়, তাতে যেন কোনো খাদ মেশানো না থাকে অর্থাৎ কোনো আকাঙ্ক্ষাই যেন না থাকে। যেখানে কোনো কিছু চাওয়া হয়, সেখানে ভালোবাসা কোথায় ? সেখানে তো আসক্তি, বাসনা, মোহ আর মমতাই থাকে। তাই গোপীরা সাবধান করে বলেছেন যে—

মা যাত পান্থাঃ পথি ভীমরথ্যাং
দিগম্বরঃ কোঽপি তমালনীলঃ।
বিন্যস্তহস্তোঽপি নিতম্ববিম্বে
ধূতঃ সমাকর্ষতি চিত্তবিত্তম্॥

'আরে পথিক ! ওই রাস্তা দিয়ে যেও না, ওখানে বিপদ আছে। ওখানে কোমরে দুহাত রেখে তমালের ন্যায় নীলবর্ণের এক উলঙ্গ বালক দাঁড়িয়ে আছে, যাকে শুধু দেখতেই সাধুর মতো ! আসলে তার কাছ দিয়ে যে কেউই যাক না কেন, সেই পথিকের চিত্তরূপী ধন লুণ্ঠন না করে সে ছাড়ে না।'

ওই যে কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ বালকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে লুট

করে নেবে, তুমি রিক্ত হয়ে যাবে ! ও এমন চোর যে সমস্ত শেষ করে দেবে। ওদিকে খবরদার যেও না, প্রথম থেকেই খেয়াল রেখো। যদি যেতে চাও তাহলে সর্বদার জন্য যেতে হবে ! সেইজন্য কেউ যদি ভালোভাবে বাঁচতে চায়, তাহলে সে যেন ওদিকে না যায়। ওর নাম যে কৃষ্ণ ! আকর্ষণকারীকেই তো কৃষ্ণ বলা হয় ! একবার যদি টেনে নেয় তাহলে আর ছাড়ে না। ওর সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় হলেই সব শেষ। তখন আর কিছুই করার থাকবে না, ত্রিভুবনে অকর্মণ্য হয়ে যাবে।

'নারায়ণ' বৌরী ভঙ্গী ডোলৈ, রহী ন কাহূ কাম কী॥
জাহি লগন লগী ঘনস্যাম কী ।

তবে এটি ঠিক যে, যে কোনো কাজের হয় না, সে সকলের সব কাজের জন্যই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কাজে তার কোনো স্বার্থ থাকে না।

শরণাগত ভক্তের সাধন-ভজনও করতে হয় না। তার দ্বারা ভজন স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে । ভগবানের নাম তার স্বাভাবিকই অত্যন্ত মিষ্ট ও প্রিয় লাগে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি নিঃশ্বাস কেন নাও ? এই বায়ুকে ভিতরে নেওয়া এবং বাইরে আনার ঝামেলা কেন করছ ? তাহলে সে বলবে যে ভাই ! এটা ঝামেলা নয়, এ ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না। তেমনই শরণাগত ভক্ত ভজন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। যাঁকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, তাঁর বিস্মরণ হলে পরম ব্যাকুলতা, মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—**'তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি'** (নারদভক্তিসূত্র ১৯)। এরূপ ভক্তকে কেউ যদি বলে যে অর্ধক্ষণের জন্য ভগবানকে ভুলে গেলে ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হবে, তবে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করবেন। ভাগবতে আছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠ

স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা

ল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫৩)

'ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও যিনি ওই দেবদুর্লভ ভগবদ্চরণকমল অর্ধনিমেষের জন্যও পরিত্যাগ করতে পারেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।'

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্ বিনান্যৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৪)

ভগবান বলেছেন যে 'যিনি আমাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য, পাতালাদি লোকের রাজ্য, যোগের সকল সিদ্ধি এবং মোক্ষও চান না।' ভরত বলেছেন—

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।

জনম জনম রতি রাম পদ য়হ বরদানু ন আন॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।২০৪)

———০———

কিছুক্ষণের জন্য সামনে আসেননি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক সময় চলে গেছে, শ্যামসুন্দরের দেখা নেই, কী করি ? কোথায় যাই ? কী করে শ্যামসুন্দরের দেখা পাওয়া যাবে ? তো এটি হল 'বিয়োগে বিয়োগ'।

বাস্তবে এই চার প্রকার অবস্থাতে ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ, যেমন ছিল তেমন সর্বদাই বজায় থাকে। বিয়োগ কখনও হয়ই না, হতে পারে না এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এই নিত্যযোগকে 'প্রেম' বলা হয়। কারণ প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ— দুজনে অভিন্ন হয়ে যান। সেখানে ভিন্নতা কখনও হতেই পারে না। প্রেমের আদান প্রদান করার জন্যই ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে সংযোগ-বিয়োগের লীলা রচিত হয়ে থাকে।

এই প্রেম প্রতিক্ষণ বর্ধমান হয় কী প্রকারে ? যখন প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ পরস্পর মিলিত হন, তখন 'প্রিয়তম আগে চলে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিয়োগ হয়েছিল ; এখন যদি আবার কোথাও চলে যান !'[১] এই ভাবের কারণে প্রেমাস্পদের মিলনে তৃপ্তি হয় না, সন্তোষও হয় না। তিনি চলে যাবেন—এই চিন্তাটাই মনকে বেশি উদ্বেলিত করে। এই কারণে এই প্রেমকে প্রতিক্ষণ বর্ধমান বলা হয়েছে।

'প্রেমে' (ভক্তিতে) চার প্রকারের রস অথবা রতি হয়— দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। এই রসগুলির মধ্যে দাস্যের চেয়ে সখ্য, সখ্যের চেয়ে বাৎসল্য এবং বাৎসল্যের চেয়ে মাধুর্য রস শ্রেষ্ঠ ; কারণ এদের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবানের ঐশ্বর্যের বিস্মৃতি অধিক হতে থাকে।

---

[১] যোগ এবং বিয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রেম-রসের বৃদ্ধি হয়। যদি সর্বদা যোগই থাকে, বিয়োগ না থাকে, তাহলে প্রেম-রস বর্ধিত হবে না, বরং অখণ্ড এবং এক রস থাকবে। এইজন্য প্রেম-রস বৃদ্ধি করতে ভগবান অর্ন্তধানও হয়ে যান।

রাখেন এবং কানাই বনে গেলে তাঁর উপর নজর রাখবার জন্য বলরামকে সঙ্গে পাঠান।

'মাধুর্য'[১] রতিতে ভক্তের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্যের বিশেষ স্মৃতি বজায় থাকে, তাই এই রতিতে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা (ঘনিষ্ঠ আপনত্ব) স্বীকার করেন (মানেন)। অভিন্নতা মানার দরুণ 'তাঁর জন্য সুখদায়ক সামগ্রী জোটাতে হবে, তাঁকে সুখ-আরাম প্রদান করতে হবে, তাঁর কোনো প্রকারের অসুবিধা যেন না হয়'—এইরকম ভাব বজায় থাকে।

প্রেম-রস অলৌকিক, চিন্ময়। কেবল ভগবানই এর আস্বাদন করেন। প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ—দুজনেই চিন্ময়-তত্ত্ব হন। কখনও প্রেমিক প্রেমাস্পদ হয়ে যান এবং কখনও প্রেমাস্পদ প্রেমিক

---

[১]প্রায়শঃ লোকে মাধুর্যভাবের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের ভাবই বোঝে, কিন্তু এই ভাব স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধেই হবে—এমন নিয়ম নেই।

মাধুর্য শব্দটির অর্থ মধুরতা অর্থাৎ মিষ্টত্ব এবং এই মিষ্টত্ব আসে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে। এই অভিন্নতা যত অধিক হবে, মধুরতাও ততটাই অধিক হবে। এই কারণে দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য ভাবের মধ্যে যে কোনো একটি ভাবে পূর্ণতা হলে তার মধ্যে মধুরতার ঘাটতি থাকবে না। সুতরাং ভক্তির সমস্ত রকমের ভাবেই মাধুর্যভাব বিরাজ করে।

অভেদ এবং অভিন্নতার মধ্যে পার্থক্য আছে। যার মধ্যে কেবল একটি তত্ত্বই থেকে যায়, দ্বৈতভাব সর্বথা সমাপ্ত হয়ে যায়, তার নাম 'অভেদ' এবং দুই হয়েও এক থাকার নাম 'অভিন্নতা'। যেমন—দুই বন্ধুর ভিতরে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার দরুণ অভিন্নতা থাকে। অভিন্নতা যতটা গাঢ় হয়, মাধুর্যরস ততটাই প্রকট হয়। একেই প্রেম রস বলা হয়। ভগবানও এই প্রেম-রসের জন্য লালায়িত হন। এই প্রেম-রসের আস্বাদনের জন্যই ভগবান এক থেকে অনেক রূপ হয়ে যান—**'একাকী ন রমতে।'** (বৃহদারণ্যক. ১।৪।৩), **'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'** (ছান্দোগ্য. ৬।২।৩)।

।। শ্রীহরিঃ ।।

শরণাগতি

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ নং শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা]

ন বিদ্যা যেষাং শ্রীর্ন শরণমপীষন্ন চ গুণাঃ
পরিত্যক্তা লোকৈরপি বৃজিনযুক্তাঃ শ্রুতিজড়াঃ।
শরণ্যং যং তেঽপি প্রসৃতগুণমাশ্রিত্য সুজনা
বিমুক্তাস্তং বন্দে যদুপতিমহং কৃষ্ণমমলম্।।

'যার না আছে বিদ্যা, না কোনও ধন-সম্পদ, নেই কোনও আশ্রয় ; যার মধ্যে কোনও গুণ নেই ; বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞানেও যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; যাকে পাপী মনে করে জগতের সবাই পরিত্যাগ করেছে, এরূপ ব্যক্তিও যে শরণাগতপালক পরম প্রভুর শরণ গ্রহণ করে সন্ত-মহাত্মা হয়ে মুক্তি লাভ করেন, সেই জগৎ-বিখ্যাত অমলাত্মা যদুনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।'

'প্রেম' সম্বন্ধে বিশেষ কথা

মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করলে সংসারের সঙ্গে নিত্যবিয়োগ হয়ে যায়[১] এবং ভগবদ্‌পরায়ণ হলে ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ স্থাপিত হয়। এই নিত্যযোগে (প্রেমে) যোগ, নিত্যযোগে বিয়োগ, বিয়োগে নিত্যযোগ এবং বিয়োগে বিয়োগ— চিত্ত তথা মনের বৃত্তির সহায়তায় এই চার প্রকার অবস্থা হয়। এই চার প্রকার অবস্থা এইভাবে অনুধাবন করা উচিত—

যেমন, শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলন হল 'নিত্যযোগে যোগ'। মিলন হওয়ার পরেও শ্রীরাধার মধ্যে এমন ভাব আসে যে প্রিয়তম যেন কোথায় চলে গেছেন আর তিনি একেবারে আকুল হয়ে বলেন 'হে প্রিয় ! তুমি কোথায় চলে গেছ !' এই হল 'নিত্যযোগে বিয়োগ'। শ্যামসুন্দর সামনে নেই, কিন্তু মনে গভীরভাবে তাঁরই চিন্তা হচ্ছে এবং মনের দ্বারা যেন দেখা যাচ্ছে যে, তিনি প্রত্যক্ষই যেন মিলিত হচ্ছেন। এই হল 'বিয়োগে নিত্যযোগ'। শ্যামসুন্দর

---

[১]বাস্তবে সংসারের সঙ্গে কখনই সংযোগ হতে পারে না, বরং তার সঙ্গে তো নিত্য বিয়োগই হয়ে থাকে। যখন মনে কোনো বস্তুর চিন্তা হয়, তো আসলে সেইটি হয় বস্তুর সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগের দরুণ, যার জন্য বস্তুটি না পাওয়া গেলে দুঃখ হয়। যখন বস্তুটি বাহ্যতঃ লাভ হয়, তখন সেই বস্তুটির সঙ্গে ভিতর (অন্তর) থেকে বিয়োগ হয়ে যায়, যার ফলে সুখ লাভ হয়। এইভাবে কোনো কারণবশতঃ বাহ্যতঃ বস্তুটির অভাব বা বস্তুটি নষ্ট হলে, মনের সঙ্গে সেই বস্তুটির সংযোগ হলে দুঃখ হয় এবং বিবেক-বিচার দ্বারা 'এই বস্তুটি কখনই আমার ছিল না, কখনই আমার হতে পারে না' এই প্রকারে বস্তুটির চিন্তা মন থেকে ত্যাগ করলে সুখ লাভ হয়। তাৎপর্য হল যে ভিতরে (অন্তরে) সংযোগ মানলে বাহিরে বিয়োগ হয় এবং বাহিরে সংযোগ মানলে ভিতরে বিয়োগ হয়। অতএব, বাস্তবে সংসারের সঙ্গে নিত্য বিয়োগই হয়ে থাকে। মানুষ কেবল ভুলবশতঃ সংসারের সঙ্গে সংযোগ মেনে নেয়।

যখন এই চারটি রসের মধ্যে কোনো একটিও রস পূর্ণতা লাভ করে, তখন তার মধ্যে অন্য রসের ন্যূনতা থাকে না অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত রসই এসে যায়। যেমন দাস্যরস পূর্ণতা লাভ করলে তার মধ্যে সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য— তিনটি রসই এসে যায়। এই কথাটি অন্য রসগুলির বিষয়েও প্রযোজ্য। কারণ হল যে ভগবান পূর্ণ, তাঁর প্রেমও পূর্ণ এবং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবও স্বয়ং পূর্ণই। অপূর্ণতা তো কেবল সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ হলেই আসে। এইজন্য ভগবানের সাথে যে কোনো রকমভাবেই রতি হয়ে গেলে সে পূর্ণ হয়ে যাবে, তার মধ্যে কোনো ন্যূনতা থাকবে না।

'দাস্য' রতিতে ভক্তের ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে যে ভগবান আমার স্বামী এবং আমি তাঁর সেবক। আমার উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার। তিনি যেমন চান তেমন করুন, যেমন চান তেমন পরিস্থিতিতে রাখুন এবং আমার দ্বারা যেমন চান তেমন কাজ করান। আমার প্রতি তাঁর অত্যধিক আপনত্ব হওয়ার দরুণই তিনি আমার কোনোরকম সম্মতি না নিয়েই আমার জন্য সব বিধান করেন।

'সখ্য' রতিতে ভক্তের ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে যে ভগবান আমার সখা এবং আমি ভগবানের সখা। তিনি আমার প্রিয় এবং আমিও তাঁর প্রিয়। আমার উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার এবং তাঁর উপরও আমার পূর্ণ অধিকার। এর জন্য আমি তাঁর কথা মানি, সুতরাং আমার কথাও তাঁকে মানতে হবে।

'বাৎসল্য' রতিতে ভক্তের নিজের মধ্যে স্বামীভাব থাকে যে আমি ভগবানের মাতা অথবা পিতা অথবা গুরু এবং তিনি আমার সন্তান অথবা শিষ্য ; এবং এই জন্য তাঁর পালন-পোষণ করতে হবে। তাঁর প্রতি নজরও রাখতে হবে যাতে তিনি কোনো আপদ-বিপদে না পড়েন। যেমন— নন্দবাবা এবং যশোদা মাতা কানাইয়ের খেয়াল

হয়ে যান। এইজন্য একটি চিন্ময় তত্ত্বই প্রেম আস্বাদনের জন্য দুই রূপে হয়ে যান।

প্রেম তত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পেরে কিছু লোক সাংসারিক 'কাম'কেই প্রেম নামে অভিহিত করেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই ভ্রান্ত। কারণ চুরাশী লক্ষ যোনির সমস্ত জীবের মধ্যেই তো 'কাম' থাকে এবং সেই সমস্ত জীবের মধ্যেও যারা ভূত, প্রেত, পিশাচ হয়, তাদের মধ্যে 'কাম' (সুখভোগের ইচ্ছা) অত্যধিকভাবে থাকে। কিন্তু কেবল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই প্রেমের অধিকারী হন।

কামের মধ্যে তো কেবল নেওয়ারই ভাবনা থাকে এবং প্রেমের মধ্যে কেবল দেওয়ারই ভাবনা থাকে। কামের মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয়-গুলির তৃপ্তি এবং সেগুলির দ্বারা সুখ ভোগ করবার ভাব থাকে এবং প্রেমের মধ্যে নিজের প্রেমাস্পদকে সুখ প্রদান করার তথা সেবা-পরায়ণ হওয়ার ভাব থাকে। 'কাম' কেবল শরীরকে নিয়েই হয় এবং 'প্রেম' স্থূলদৃষ্টিতে শরীরের সঙ্গে মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু চিন্ময়-তত্ত্বর সঙ্গেই হয়। কামের মধ্যে মোহ (মূঢ়ভাব) থাকে এবং প্রেমের মধ্যে মোহ'র লেশমাত্রও থাকে না। কামের মধ্যে সংসার তথা সংসারের দুঃখ ভরা থাকে এবং প্রেমের মধ্যে মুক্তি তথা মুক্তির চাইতেও অনুপম আনন্দ থাকে। কামের মধ্যে জড়তা (শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি)র মুখ্যতা থাকে এবং প্রেমের মধ্যে চিন্ময়তা (চেতন স্বরূপ)র মুখ্যতা থাকে। কামের মধ্যে রাগ (কামনা) থাকে আর প্রেমের মধ্যে ত্যাগ থাকে। কামের মধ্যে পরতন্ত্রতা থাকে আর প্রেমের মধ্যে পরতন্ত্রতার লেশমাত্রও থাকে না অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা থাকে। কামের মধ্যে 'সে আমার কাজে আসুক' এই ভাব থাকে এবং প্রেমের মধ্যে 'আমি তার কাজে এসে যাব' এই ভাব থাকে। কামের

দ্বারা কামনাকারী ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুর গোলাম হয়ে যায় এবং প্রেমের দ্বারা স্বয়ং ভগবান প্রেমিকের গোলাম হয়ে যান। কামের রস নীরসতায় পরিবর্তিত হয় এবং প্রেমের রস আনন্দরূপে প্রতিক্ষণ বর্ধিত হয়। 'কাম' খিন্নতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রেম প্রেমাস্পদের প্রসন্নতা থেকে প্রকটিত হয়। কামের মধ্যে নিজের প্রসন্নতা সিদ্ধিরই উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রেমের মধ্যে প্রেমাস্পদের প্রসন্নতা সাধনেরই উদ্দেশ্য থাকে। কাম-মার্গ নরকগামী হয় এবং প্রেম-মার্গ ভগবৎগামী হয়। কামের মধ্যে দুই হয়ে দুইই থেকে যায় অর্থাৎ দ্বৈতভাব (ভিন্নতা অথবা ভেদ) কখনও মেটে না এবং প্রেমের মধ্যে এক হয়েও দুই হয়ে যায় অর্থাৎ অভিন্নতা কখনও মেটে না।[১]

---
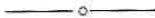
[১]দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যার্থং কল্পিতং দ্বৈতং অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥
পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে।
তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎসা তু মুক্তিশতাধিকা॥

'বোধের পূর্বে দ্বৈত তো মোহের জন্য হয়। কিন্তু বোধ হওয়ার পরে ভক্তির জন্য বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত দ্বৈত তো অদ্বৈতের চেয়েও অধিক সুন্দর হয়।'

'বাস্তবিক তত্ত্ব তো অদ্বৈতই, কিন্তু ভজনের জন্যই দ্বৈত হয়। এইরকম যদি ভক্তি হয়, তাহলে সেই ভক্তি মুক্তির চেয়েও শতাধিক শ্রেষ্ঠ।'

শ্লোক—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি কেবলমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'— ভগবান বলেছেন যে, সকল ধর্মের আশ্রয়, ধর্ম নিরূপণের বিচার পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কী করতে হবে, কী করতে হবে না—এসব কথা বাদ দিয়ে শুধু আমারই শরণাগত হও।

স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হওয়া—এ হল সকল সাধনার সার। শরণাগত ভক্তের তখন আর কোনো কিছু করার বাকি থাকে না ; যেমন—পতিব্রতা নারীর নিজের কোনো কাজ থাকে না, সে নিজ দেহের পরিচর্যা করে স্বামীরই জন্য। সে গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, বস্ত্র, পুত্র-কন্যা এবং নিজ শরীরও নিজের বলে মনে করে না, সবই পতির বলে মনে করে। অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নী যেমন পতিপরায়ণ হয়ে পতির গোত্রে নিজ গোত্র মিলিয়ে নেয় এবং পতিগৃহেই বাস করে থাকে, তেমনই শরণাগত ভক্তও তাঁর দেহের বলে মানা গোত্র, জাতি, নাম ইত্যাদি ভগবদ্‌পাদপদ্মে অর্পণ করে নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হয়ে থাকেন।

গীতানুসারে **'ধর্ম'** শব্দটি এখানে কর্তব্য-কর্মের বাচক। কারণ

এই অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত **'স্বভাবজ কর্ম'** বলা হয়েছে, পরে সাতচল্লিশতম শ্লোকে পূর্বার্ধে **'স্বধর্ম'** শব্দ উল্লেখ হয়েছে। পরে ওই শ্লোকেরই শেষে ও আটচল্লিশতম শ্লোকে **'কর্ম'** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদি ও অন্তে **'কর্ম'** শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং মধ্যস্থলে **'স্বধর্ম'** শব্দটি এসেছে, তাই এতে স্বতই 'ধর্ম' শব্দটি যে কর্তব্য-কর্মের বাচক তা প্রমাণিত হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে যে **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** পদটির দ্বারা কি ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-কর্মের স্বরূপত ত্যাগ বলে মেনে নেওয়া যায় ? তার উত্তর হল কর্তব্য-কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করা গীতানুসারেও উচিত নয় এবং এই প্রসঙ্গ অনুযায়ীও উচিত নয়, কারণ ভগবানের এই কথা শুনে অর্জুন তাঁর কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করেননি, বরং **'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) বলে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-কর্ম পালন করতে স্বীকার করেছেন। শুধু স্বীকারই নয়, তিনি ক্ষাত্রধর্মানুসারে যুদ্ধও করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত পদে ধর্ম বা কর্তব্য পরিত্যাগের কথা বলা হয়নি। ভগবানও তা কেন বলবেন ? ভগবান এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে যজ্ঞ-দান-তপ ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের যেসব কর্তব্য আছে, সেগুলি ত্যাগ করা কখনো উচিত নয়, বরং সেগুলি অবশ্য পালনীয়[১]।

---

[১]তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ না করার জন্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—কর্ম ত্যাগ করলে নৈষ্কর্ম লাভ হয় না এবং সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪) ; কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতে কর্ম না করে একমুহূর্তও থাকতে পারে না (৩।৫) ; যে ব্যক্তি বাহ্যত কর্মত্যাগ করে অন্তরে বিষয়চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী (৩।৬) ; যে ব্যক্তি মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত করে কর্তব্য-কর্ম পালন

গীতা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, মানুষের কোনো অবস্থাতেই কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। অর্জুন যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন (২।৫) ; কিন্তু ভগবান তা নিষেধ করেছিলেন (২। ৩১-৩৮)। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে এখানে ধর্মকে স্বরূপত

করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৩।৭) ; কর্ম বিনা শরীর নির্বাহ হয় না, তাই কর্ম করা উচিত (৩।৮) ; '**কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ**'—এই বন্ধনের ভয়েও কর্মত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্য করা কর্ম বন্ধনকারক নয়, বরং কর্তব্য-কর্মের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখা ছাড়া নিজের জন্য কোনো কিছু কর্ম করাই বন্ধনকারক হয় (৩।৯) ; ব্রহ্মা কর্তব্য-সহ প্রজাসৃষ্টি করে বলেছেন যে, এই কর্তব্য-কর্মের দ্বারাই তোমাদের বৃদ্ধি হবে এবং এই কর্তব্য-কর্ম তোমাদের কর্তব্য-সামগ্রী প্রদানকারী হবে (৩।১০) ; মানুষ ও দেবতা উভয়েই কর্তব্য পালনের দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে (৩।১১) ; যে ব্যক্তি কর্তব্য পালন না করে প্রাপ্ত সামগ্রী উপভোগ করে, সে চোর (৩।১২) ; কর্তব্য-কর্ম করে নিজের নির্বাহকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য কর্ম করে, সেই পাপী পাপ ভক্ষণ করে (৩।১৩) ; কর্তব্য পালনের দ্বারাই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি জগতে থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে না, তার জীবন ব্যর্থ (৩।১৬) ; আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্তব্য-কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (৩।১৯) ; জনকাদি জ্ঞানীগণও কর্তব্য-কর্ম করে সিদ্ধিলাভ করেছেন ; লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও কর্তব্য-কর্ম পালন করা উচিত (৩।২০) ; ভগবান তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, যদি আমি সতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন না করি, তাহলে আমি বর্ণ-সংকরের উৎপাদক এবং লোকনাশকারী হব (৩।২৩-২৪) ; জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও আসক্তি পরিত্যাগ করে আস্তিক অজ্ঞানীদের মতো কর্তব্য-কর্ম পালন করা উচিত (৩।২৫) ; জ্ঞানীদের উচিত যে তাঁরা যেন অজ্ঞানীদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেন এবং তাদের দ্বারাও সেইরূপ করান (৩।২৬)। এইরূপে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্তব্য-কর্ম পালনের ওপর খুব জোর দিয়েছেন।